
রাধারাণী
ইন্দিরা

4.4

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত
(কলিকাতা গেজেট, ১৯শে মার্চ্চ, ১৯৫২)

'বঙ্কিম গ্রন্থমালা'র ১১নং গ্রন্থ—

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের



রাধারাণী

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

জুন
১৯৮৫
১০

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ৮·০০

উপহার



ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র বড় উপন্যাস রচনার সঙ্গে-সঙ্গে দু'চারটি ছোট-ছোট উপন্যাসও রচনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে ইন্দিরা আর রাধারাণী এই গ্রন্থে একসঙ্গে প্রকাশিত হলো। ইন্দিরা আর রাধারাণী, এই দুটি গল্পে বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়কার বাঙালী সামাজিক-জীবনের দুঃখকষ্ট বেদনা-হর্ষকে রূপ দিয়েছেন। এই কাহিনীর মধ্যে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র কি অপরূপ দরদ নিয়ে বাংলার সমাজ-জীবনকে দেখেছিলেন। বাংলার ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-সমাজে, বাংলার মধ্যবিত্ত-পরিবারে ধীরে-ধীরে যে ভাঙ্গন আর বিপর্য্যয়ের ফাটল ফুটে উঠেছিল, তার ভেতর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র কতকগুলি আদর্শ নর-নারীর চিত্র অঙ্কন ক'রে গিয়েছেন। এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের জাতির দুর্ব্বলতা আর আমাদের জাতির গরিমা, অপূর্ব্ব নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাছাড়া এইসব কাহিনীর মধ্যে এত-বড় আদর্শবাদ, এত-বড় একটা ধর্ম্ম-বুদ্ধি জাগ্রৎ হয়ে আছে যে, একদিন সেই আদর্শকে অবলম্বন করেই আবার বাঙালী জাতি জেগে উঠবে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

যতদিন জগতে বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলাভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙালীর বুকে অমর হইয়া থাকিবেন। সাহিত্যক্ষেত্রে হয়তো তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তবুও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সকলের উপরে থাকিবে। কারণ, তিনি যে শুধু জগতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক, তাই নয়,—মানব-ইতিহাসে অতি অল্প-সংখ্যক এক-জাতের লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সভ্যতার রথ আগাইয়া চলে, ইংরেজীতে তাঁহাদের বলে pioneer, বাংলাভাষায় আমরা বলি, 'পথিকৃৎ'—যাঁহারা পথ তৈয়ারি করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্য এবং আমাদের জাতীয়-জীবনে সেই পথিকৃৎ।

তিনি যে পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'তিনি যে আমাদের জন্য শুধু পথ তৈয়ারি করিয়া দিয়া গেলেন, তাহা নয়, চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অন্তরে যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একক-সম্রাটের মতন বসিয়া আছেন।

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র নৈহাটীর কাছে কাঁঠালপাড়া-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন—১৮৩৮, ২৬শে জুন। নৈহাটী ষ্টেশনের মুখে ঢুকিতে রেল-লাইনের ধারেই তাঁহার বাড়ী চোখে পড়ে। এই বাড়ীটিই আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটী-কলেক্টর ছিলেন। কাজ হইতে অবসর লইয়া তিনি কাঁঠালপাড়াতেই বাস করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব সেখানেই অতিবাহিত হয়। ছেলেবেলায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর তিনি 'ডবল প্রমোশন' পাইতেন—ছেলেবেলা হইতে আবৃত্তি করিতে খুব ভালোবাসিতেন।

মাত্র এগারো বৎসর বয়সে তিনি হুগলী-কলেজে ভর্ত্তি হন। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি সেকালের জুনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ও তাহার দুই বৎসর পরে তিনি সিনিয়র-স্কলারশিপ পরীক্ষাতেও প্রথমস্থান অধিকার করেন। ইহার দুই বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম এনট্রান্স ও

বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম-দলে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম বি-এ পাশ ছাত্র। বি-এ পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার সময়েই তিনি ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়া যান এবং চাকরি করিতে-করিতে তিনি আইন-পরীক্ষা দেন।

তাহার পর ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রত্যেক জায়গাতেই বিচারক হিসাবে তাঁহার প্রচুর খ্যাতি হয়। সর্ব্বসময় তিনি আইনের মর্য্যাদা রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কাহাকেও খাতির করিতেন না। সেখানে তিনি এতটুকু অন্যায় সুবিধা, বা সুযোগ কাহাকেও দিতেন না। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরকাল সগৌরবে ডেপুটী-ম্যজিষ্ট্রেটগিরি করার পর তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী-কলেজে কিশোর ছাত্ররূপে তিনি সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার তের বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় বাংলা-সাহিত্যে একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি সে-সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। লোকে তাঁহার রসাল কবিতা ও ছড়া পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র মনে-মনে তাঁহাকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার মত কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি কাগজ ছিল। সেই কাগজের নাম, 'সংবাদ-প্রভাকর'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম লেখা সেই 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলি সবই কবিতা।

তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্য একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল, তাহার ভাষা এমন আড়ষ্ট, সংস্কৃত অনুস্বার-বিসর্গ আর সমাসের এমনি ছড়াছড়ি আর মাখামাখি যে, তাহাকে সাহিত্যই বলা চলে না। তাহার মধ্যে মাত্র একজন সাহিত্যিক তখন কথ্য-ভাষায় গদ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার নাম টেকচাঁদ ঠাকুর। সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করিলেন, তাহার ভাষা, বিন্যাস এবং ভাব দেখিয়া বাঙালী বিমোহিত হইয়া গেল।

সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষার মাঝামাঝি তিনি এমন অপরূপ এক গদ্য-ভাষা সৃষ্টি করিলেন, যাহার ছন্দে বাংলা-সাহিত্যে নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। ভাষার

রাধারাণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই। তাহাদিগের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল—বড়মানুষের মেয়ে। কিন্তু তাহার পিতা নাই; তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির একটি মোকদ্দমা হয়; সর্ব্বস্ব লইয়া মোকদ্দমা; মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল। সে হারিবামাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া ভদ্রাসন হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। প্রায় দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি; ডিক্রীদার সকলই লইল। খরচা ও ওয়াশিলাত দিতে নগদ যাহা ছিল, তাহাও গেল; রাধারাণীর মাতা অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, প্রিবিকৌন্সিলে একটি আপীল করিল। কিন্তু আর আহারের সংস্থান রহিল না। বিধবা একটি কুটীরে আশ্রয় লইয়া কোন প্রকারে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল। রাধারাণীর বিবাহ দিতে পারিল না।

কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্ব্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িতা হইল—যে কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল। সুতরাং আর আহার চলে না। মাতা রুগ্না, এ জন্য কাজে-কাজেই তাহার উপবাস; রাধারাণীর জুটিল না বলিয়া উপবাস। রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন হইল, কিন্তু পথ্য কোথা? কি দিবে?

যেএমন গতি থাকিতে পারে, ভাষার যে প্রাণ থাকিতে পারে, গদ্য-সাহিত্যেরও যে একটা ছন্দ আছে, সেই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত হইল। তারপর নির্ঝরিণী-ধারার মত বঙ্কিমচন্দ্র একটার পর একটা উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা প্রভৃতি একটির পর একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

উপন্যাস ছাড়া, তিনি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাঙালীর চেতনা জাগাইবার জন্য নানারকম নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবন তখন ঘন-অন্ধকারে লীন। তাহার ইতিহাস নাই, জাতীয়-গৌরব সম্বন্ধে চেতনা নাই, সমাজে অসংখ্য ত্রুটি ও অন্যায়, রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে সে পরাধীন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন……বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমাদের জাতীয়-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবনের সমস্ত অভাব ও দৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহিত্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল, সব দিক হইতে বাঙালীর চেতনাকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন।

বঙ্কিমের প্রধান অসুবিধা ছিল যে, তিনি সরকারী চাকুরে। বিশেষ করিয়া সে-যুগে ব্রিটিশ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন-কিছু বলা, বা করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই বিরূপ অবস্থার মধ্য হইতে তিনি এই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিলেন, 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, পরাধীন জাতির মুখে তাহার জাগরণ-মন্ত্রকে তুলিয়া দিলেন—"বন্দে-মাতরম্!"

অন্ধকার অরণ্যের মধ্য হইতে তিনি স্বহস্তে ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া প্রশস্ত পথ তৈয়ার করিয়া দিয়া গেলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন। সেই পথ ধরিয়াই আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি। তাঁহার 'কমলাকান্ত' মাতৃ-রূপের যে স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, আমাদের জীবনে আজ সে-স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সেই সময়ের মধ্যে বিপুল রাজকার্য্য সগৌরবে সম্পন্ন করিয়া, তিনি এই জাতির পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভার একা স্বহস্তে সরাইয়া গিয়াছেন।

বাঙালীর নব-জন্মদাতা…সাহিত্যিক-গুরু, তোমাকে প্রণাম!

—বন্দে মাতরম্!



প্রদীপের আলোয় রাধারাণী দেখিল, নোটই বটে! তাতে রাধারাণীর নাম লেখা আছে।

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল। মনে করিল যে, এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া দুটি একটি পয়সা পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে।

কিন্তু রথের টান অর্দ্ধেক হইতে না হইতেই বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টি দেখিয়া লোক ভাঙ্গিয়া গেল। মালা কেহ কিনিল না। রাধারাণী মনে করিল যে, আমি একটু না হয় ভিজিলাম—বৃষ্টি থামিলেই আবার লোক জমিবে। কিন্তু বৃষ্টি আর থামিল না। লোক আর জমিল না। সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল—বড় অন্ধকার হইল—অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।

অন্ধকার—পথ কর্দ্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না। তাহাতে মুষলধারে শ্রাবণের ধারা বর্ষিতেছিল। মাতার অন্নাভাব মনে করিয়া তদপেক্ষাও রাধারাণীর চক্ষু বারি বর্ষণ করিতেছিল। রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল—কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিতেছিল, আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় খাইতেছিল। দুই গণ্ডবিলম্বী ঘন কৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বৃষ্টির জল পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল—ফেলে নাই।

এমন সময় অন্ধকারে, অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ের উপর পড়িল। রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই—এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।

যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল, "কে গা তুমি কাঁদ ?"

পুরুষমানুষের গলা—কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বন্ধ হইল। রাধারাণীর চেনা লোক নহে—কিন্তু বড় দয়ালু লোকের কথা—রাধারাণীর ক্ষুদ্রবুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল। রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল, "আমি দুঃখী লোকের মেয়ে। আমার কেহ নাই—কেবল মা আছে।"

সে পুরুষ বলিল, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?"

রাধা। আমি রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাড়ী যাইব। অন্ধকারে, বৃষ্টিতে পথ দেখিতে পাইতেছি না।

পুরুষ বলিল, "তোমার বাড়ী কোথায় ?"

রাধারাণী বলিল, "শ্রীরামপুর।"

সে ব্যক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আইস—আমিও শ্রীরামপুর যাইব। চল, কোন্ পাড়ায় তোমার বাড়ী—তাহা আমাকে বলিয়া দিও—আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপে সে ব্যক্তি রাধারাণীকে লইয়া চলিল। অন্ধকারে সে রাধারাণীর বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী বড় বালিকা।

তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বয়স কত ?"

রাধা। দশ-এগার বছর।

"তোমার নাম কি ?"

রাধা। রাধারাণী।

"হ্যাঁ রাধারাণী! তুমি ছেলেমানুষ, একলা রথ দেখিতে গিয়াছিলে কেন ?"

তখন সে কথায়-কথায় মিষ্ট-মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া, সেই এক পয়সার বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া লইল। শুনিল যে, মাতার পথ্যের জন্য বালিকা এই মালা গাঁথিয়া রথহাটে বেচিতে গিয়াছিল—রথ দেখিতে যায় নাই—সে মালাও বিক্রয় হয় নাই—এক্ষণেও বালিকার হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত আছে। তখন সে বলিল, "আমি একছড়া মালা খুঁজিতেছিলাম। আমাদের বাড়ীতে ঠাকুর আছেন, তাঁহাকে পরাইব। রথের হাট শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল—আমি তাই মালা কিনিতে পারি নাই। তুমি মালা বেচ ত আমি কিনি।"

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল যে, আমাকে যে এত যত্ন করিয়া, হাত ধরিয়া, এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার

কাছে দাম লইব কি প্রকারে? তা নহিলে, আমার মা খেতে পাবে না। তা নিই।

এই ভাবিয়া রাধারাণী, মালা সমভিব্যাহারীকে দিল। সমভিব্যাহারী বলিল, "ইহার দাম চারি পয়সা—এই লও।" সমভিব্যাহারী এই বলিয়া মূল্য দিল। রাধারাণী বলিল, "এ কি পয়সা? এ যে বড় বড় ঠেকছে!"

"ডবল পয়সা—দেখিতেছ না, দুইটা বই দিই নাই।"

রাধা। তা, এ যে অন্ধকারেও চক্‌চক্ করছে। তুমি ভুলে টাকা দাও নাই ত'?

"না। নূতন কলের পয়সা, তাই চক্‌চক্ করছে।"

রাধা। তা, আচ্ছা, ঘরে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে যদি দেখি যে, পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাঁড়াইতে হইবে।

কিছু পরে তাহারা রাধারাণীর মার কুটীর-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া রাধারাণী বলিল, "তুমি ঘরে আসিয়া দাঁড়াও, আমরা আলো জ্বালিয়া দেখি, টাকা কি পয়সা।"

সঙ্গী বলিল, "আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি, তুমি আগে ভিজা-কাপড় ছাড়—তারপর প্রদীপ জ্বালিও।"

রাধারাণী বলিল, "আমার আর কাপড় নাই—একখানি ছিল, তাহা কাচিতে দিয়াছি। তা' আমি ভিজা-কাপড়ে সর্ব্বদা থাকি, আমার ব্যামো হয় না। আঁচলটা নিংড়ে পরিব এখন! তুমি দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালি।"

"আচ্ছা।"

ঘরে তৈল ছিল না, সুতরাং চালের খড় পাড়িয়া চক্‌মকি ঠুকিয়া আগুন জ্বালিতে হইল। আগুন জ্বালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল। আলো জ্বালিয়া রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে।

তখন রাধারাণী বাহিরে আসিয়া আলো ধরিয়া তল্লাস করিয়া দেখিল যে, যে টাকা দিয়াছে, সে নাই—চলিয়া গিয়াছে।

রাধারাণী তখন বিষণ্ণ-বদনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিল—সকাতরে বলিল—"মা! এখন কি হবে?"

মা বলিল, "কি হবে বাছা! সে কি আর না জেনে টাকা দিয়েছে? সে দাতা, আমাদের দুঃখ শুনিয়া দান করিয়াছে—আমরাও ভিখারী হইয়াছি, দান গ্রহণ করিয়া খরচ করি।"

তাহারা এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া তাহাদের কুটীরের আগড় ঠেলিয়া বড় সোরগোল উপস্থিত করিল। রাধারাণী দ্বার খুলিয়া দিল—মনে করিয়াছিল যে, সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। পোড়া কপাল! তিনি কেন? এ যে পদ্মলোচন।

রাধারাণীর মার কুটীর বাজারের অনতিদূরে। তাহাদের কুটীরের নিকটেই পদ্মলোচন সাহার কাপড়ের দোকান। পদ্মলোচন খোদ,—একজোড়া নূতন কুঞ্জদার শান্তিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, এখন দ্বার খোলা পাইয়া তাহা রাধারাণীকে দিল। বলিল, "রাধারাণীর এই কাপড়।"

রাধারাণী বলিল, "ও মা! আমার কিসের কাপড়!"

রাধারাণীর কথা শুনিয়া পদ্মলোচন কিছু বিস্মিত হইল; বলিল, "কেন, এই যে এক বাবু এখনই আমাকে নগদ দাম দিয়া বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই ঐ রাধারাণীকে দিয়ে এস।"

রাধারাণী তখন বলিল, "ও মা, সেই গো! সেই। তিনিই কাপড় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ গা পদ্মলোচন—"

রাধারাণীর পিতার সময় হইতে পদ্মলোচন ইহাদের কাছে সুপরিচিত—অনেকবারই ইহাদিগের নিকট যখন সুদিন ছিল, তখন চারি টাকার কাপড় শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে-বারো আনা, আর দুই আনা মুনফা লইতেন।

"হ্যাঁ পদ্মলোচন—বলি, সে বাবুটিকে চেন?"

পদ্মলোচন বলিল, "তোমরা চেন না?"

রাধা। না।

পদ্ম। আমি বলি তোমাদের কুটুম্ব। আমি চিনি না।

যাহা হউক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনফা আট টাকা সাড়ে-চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া, প্রসন্নমনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাধারাণী প্রাপ্ত টাকা ভাঙ্গাইয়া মার পথ্যের উদ্যোগের জন্য বাজারে গেল। বাজার করিয়া, তেল আনিয়া প্রদীপ জ্বালিল। মার জন্য যৎকিঞ্চিৎ রন্ধন করিল। স্থান পরিষ্কার করিয়া মাকে অন্ন দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর ঝাঁটাইতে লাগিল। ঝাঁটাইতে একখানা কাগজ কুড়াইয়া পাইল—হাতে করিয়া তুলিল—"এ কি মা!"

মা দেখিয়া বলিলেন—"একখানা নোট!"

রাধারাণী বলিল, "তবে তিনি ফেলিয়া গিয়াছেন।"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ! তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, তোমার নাম লেখা আছে।"

রাধারাণী বড়ঘরের মেয়ে, একটু অক্ষরপরিচয় ছিল। সে পড়িয়া দেখিল, তাই বটে। লেখা আছে।

রাধারাণী বলিল, "হ্যাঁ মা, এমন লোক কে মা?"

মা বলিলেন, "তাঁহার নামও নোটে লেখা আছে। পাছে কেহ চোরা নোট বলে, এইজন্য নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম, রুক্মিণীকুমার রায়।"

পরদিন মাতা-কন্যায়, রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে বা নিকটবর্তী কোন স্থানে রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত কোন সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল না, তুলিয়া রাখিল—তাহারা দরিদ্র কিন্তু লোভী নহে।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাধারাণীর মাতা পথ্য করিলেন বটে, কিন্তু সে রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অতিশয় ধনী ছিলেন, এখন অতি দুঃখিনী হইয়াছিলেন, এই শারীরিক এবং মানসিক দ্বিবিধ কষ্ট তাঁহার সহ্য হইল না। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, তাঁহার শেষকাল উপস্থিত হইল।

এমত সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ আসিল যে, প্রিবি কৌন্সিলের আপীল তাঁহার পক্ষে নিষ্পত্তি পাইয়াছে, তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, ওয়াশিলাতের টাকা ফেরত পাইবেন এবং আদালতের খরচা পাইবেন।

কামাখ্যানাথবাবু তাঁহার পক্ষে হাইকোর্টের উকিল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সংবাদ লইয়া রাধারাণীর মাতার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। সুসংবাদ শুনিয়া রুগ্নার অবিরল নয়নাশ্রু পড়িতে লাগিল।

তিনি নয়নাশ্রু সংবরণ করিয়া কামাখ্যাবাবুকে বলিলেন, "যে প্রদীপ নিবিয়াছে, তাহাতে তেল দিলে কি হইবে? আপনার এ সুসংবাদেও আমার আর প্রাণরক্ষা হইবে না। আমার আয়ুশেষ হইয়াছে। তবে আমার এই সুখ যে, রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না। তাই বা কে জানে? সে বালিকা, তাহার এ সম্পত্তি কে রক্ষা করিবে? কেবল আপনিই ভরসা। আপনি আমার এই অন্তিমকাল, আমাকে একটা ভিক্ষা দিউন, নহিলে আর কাহার কাছে চাহিব?"

কামাখ্যাবাবু অতি ভদ্রলোক এবং তিনি রাধারাণীর পিতার বন্ধু ছিলেন।

রাধারাণীর মাতা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে, তিনি রাধারাণীর মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, যতদিন না আপীল নিষ্পত্তি পায়, অন্ততঃ ততদিন তোমরা আসিয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার

মত তোমাকে রাখিব। রাধারাণীর মাতা তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। পরিশেষে কামাখ্যাবাবু কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতে চাহিলেন। "আমার এখনও কিছু হাতে আছে—আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইব।" এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া রাধারাণীর মাতা সে সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। রুক্মিণীকুমারের দান গ্রহণ তাঁহাদিগের প্রথম ও শেষ দান গ্রহণ।

কামাখ্যাবাবু এতদিন বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। দশা দেখিয়া কামাখ্যাবাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন। আবার রাধারাণীর মাতা, যুক্ত করে তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছেন দেখিয়া আরও কাতর হইলেন; বলিলেন, "আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কি করি। আপনার যাহা প্রয়োজনীয়, আমি তাহাই করিব।"

রাধারাণীর মাতা বলিলেন, "আমি চলিলাম, কিন্তু রাধারাণী রহিল। এক্ষণে আদালত হইতে আমার শ্বশুরের যথার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব রাধারাণী একা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার কন্যার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিবেন, এই আমার ভিক্ষা। আপনি এই কথা স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।"

কামাখ্যাবাবু বলিলেন, "আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি রাধারাণীকে আপন কন্যার অধিক যত্ন করিব। আমি কায়মনোবাক্যে এ-কথা কহিলাম; আপনি বিশ্বাস করুন।"

যিনি মুমূর্ষু, তিনি কামাখ্যাবাবুর চক্ষের জল দেখিয়া, তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার সেই শীর্ণ শুষ্ক অধরে একটু আহ্লাদের হাসি দেখা দিল। হাসি দেখিয়া কামাখ্যাবাবু বুঝিলেন, ইনি আর বাঁচিবেন না।

কামাখ্যাবাবু তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন যে, "এক্ষণে আমার গৃহে চলুন, পরে ভদ্রাসন দখল হইলে আসিবেন।"

রাধারাণীর মাতার যে অহঙ্কার, সে দারিদ্র্যজনিত—এজন্য

দরিদ্রাবস্থায় তাঁহার গৃহে যাইতে চাহেন নাই। এক্ষণে আর দারিদ্র্য নাই, সুতরাং আর সে অহঙ্কারও নেই। এক্ষণে তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। কামাখ্যাবাবু রাধারাণী ও তাহার মাতাকে সযত্নে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু তাঁহার জীবন-রক্ষা হইল না, অল্পদিনেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যাবাবু রাধারাণীকে তাহার সম্পত্তিতে দখল দেওয়াইলেন। কিন্তু রাধারাণী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিজ-বাটীতে একা থাকিতে দিলেন না, আপন গৃহেই রাখিলেন।

কালেক্টর সাহেব, রাধারাণীর সম্পত্তি কোর্ট-অব্‌-ওয়ার্ডসের অধীনে আনিবার জন্য যত্ন পাইলেন, কিন্তু কামাখ্যাবাবু বিবেচনা করিলেন, আমি রাধারাণীর জন্য যতদূর করিব, সরকারী কর্ম্মচারিগণ ততদূর করিবে না। কামাখ্যাবাবুর কৌশলে কালেক্টর সাহেব নিরস্ত হইলেন। কামাখ্যাবাবু স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

বাকি রাধারাণীর বিবাহ। কিন্তু কামাখ্যাবাবু নব্যতন্ত্রের লোক—বাল্য-বিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমত কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী, স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া শিখুক।

এই ভাবিয়া কামাখ্যাবাবু রাধারাণীর বিবাহের কোন উদ্যোগ না করিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে সুশিক্ষিত করাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসর গেল—রাধারাণী পরম সুন্দরী যোড়শবর্ষীয়া কুমারী কিন্তু সে অন্তঃপুরমধ্যে বাস করে, তাহার সে রূপরাশি কেহ দেখিতে পায় না। এক্ষণে রাধারাণীর সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল। কামাখ্যাবাবুর ইচ্ছা, রাধারাণীর মনের কথা বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধ করেন। তত্ত্ব জানিবার জন্য আপনার কন্যা বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন।

বসন্তের সঙ্গে রাধারাণীর সখীত্ব। উভয়ে সমবয়স্কা এবং উভয়ের অত্যন্ত প্রণয়। কামাখ্যাবাবু বসন্তকে আপনার মনোগত কথা বুঝাইয়া বলিলেন।

বসন্ত সলজ্জভাবে, অথচ অল্প হাসিতে হাসিতে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে ?"

কামাখ্যাবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না। তা ত জানি না। কেন ?"

বসন্ত বলিল, "রাধারাণী রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না।"

কামাখ্যা। সে কি ? রাধারাণীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পরিচয় কি প্রকারে হইল ?

বসন্ত অবনতমুখে অল্প হাসিল। সে রথের রাত্রির বিবরণ সবিস্তারে রাধারাণীর কাছে শুনিয়াছিল, পিতার সাক্ষাতে সকল বিবৃত করিল। শুনিয়া কামাখ্যাবাবু রুক্মিণীকুমারের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "রাধারাণীকে বুঝাইয়া বলিও, রাধারাণী একটি মহাভ্রমে পড়িয়াছে। বিবাহ কৃতজ্ঞতা অনুসারে কর্ত্তব্য নহে। রুক্মিণীকুমারের নিকট রাধারাণীর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ; যদি সময় ঘটে, তবে অবশ্য প্রত্যুপকার করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহে রুক্মিণীকুমারের কোন দাবিদাওয়া নাই। তাতে আবার সে কি জাতি, কত বয়স, তাহা

কেহ জানে না। তাহার পরিবার সন্তানাদি থাকিবারই সম্ভাবনা; রুক্মিণীকুমারের বিবাহ করিবারই বা সম্ভাবনা কি?"

বসন্ত বলিল, "সম্ভাবনা কিছুই নাই, তাহাও রাধারাণী বিলক্ষণ বুঝিয়াছে, কিন্তু সে রাত্রি অবধি রুক্মিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। যেমন দেবতাকে লোকে পূজা করে, রাধারাণী সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া, প্রত্যহ মনে মনে পূজা করে; আর কেহ রাধারাণীকে বিবাহ করিলে, তাহার স্বামী সুখী হইবে না।"

কামাখ্যাবাবু রুক্মিণীকুমারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং কলিকাতায় তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গকেও সেই সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। দেশে-দেশে আপনার মক্কেলগণকে পত্র লিখিলেন। প্রতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। সে বিজ্ঞাপন এইরূপ—

"বাবু রুক্মিণীকুমার রায়, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন—বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইহাতে রুক্মিণীবাবুর সন্তোষের ব্যতীত অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইবে না। শ্রী ইত্যাদি—"

কিন্তু কিছুতেই রুক্মিণীকুমারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, তথাপি কৈ, রুক্মিণীকুমার ত আসিল না।

ইহার পর রাধারাণীর আর একটি ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইল—কামাখ্যাবাবুর লোকান্তরগতি হইল। রাধারাণী ইহাতে অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন; দ্বিতীয়বার পিতৃহীনা হইলেন মনে করিলেন। কামাখ্যাবাবুর শ্রাদ্ধাদির পর রাধারাণী আপন বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং নিজ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান স্বয়ং করিতে লাগিলেন। কামাখ্যাবাবুর বিচক্ষণতাহেতু রাধারাণীর সম্পত্তি বিস্তর বাড়িয়াছিল।

বিষয় হস্তে লইয়া রাধারাণী প্রথমেই দুই লক্ষ মুদ্রা গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলেন। তৎসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন যে, এই অর্থে

তাঁহার নিজ গ্রামে একটি অনাথ-নিবাস স্থাপিত হউক। তাহার নাম হউক—"রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ"।

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ প্রস্তাবিত নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তাহাতে কে কথা কহিবে? অনাথ-নিবাস সংস্থাপিত হইল। রাধারাণীর মাতা দরিদ্রাবস্থায় নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কেন না, যে গ্রামে যে ধনী ছিল, সে সহসা দরিদ্র হইলে সে গ্রামে তার বাস করা কষ্টকর হয়। তাঁহাদিগের নিজ গ্রাম শ্রীরামপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূর—আমরা সে গ্রামকে রাজপুর বলিব। এক্ষণে রাধারাণী রাজপুরেই বাস করিতেন। অনাথ-নিবাসও রাধারাণীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিত হইল। নানা দেশ হইতে দীন, দুঃখী, অনাথ আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুই-এক বৎসর পরে, একজন ভদ্রলোক সেই অনাথ-নিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর। অবস্থা দেখিয়া অতি ধীর গম্ভীর এবং অর্থশালী লোক বোধ হয়। তিনি সেই "রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদে"র দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী ?"

তাহারা বলিল, "এ কাহারও বাড়ী নহে, এ-স্থানে দুঃখী অনাথ লোক থাকে। ইহাকে 'রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ' বলে।"

আগন্তুক বলিলেন, "আমি ইহার ভিতরে গিয়া দেখিতে পারি ?"

রক্ষকগণ বলিল, "দীন-দুঃখী লোকেও ইহার ভিতর অনায়াসে যাইতেছে—আপনাকে নিষেধ কি ?"

দর্শক ভিতরে গিয়া সব দেখিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলিলেন, "বন্দোবস্ত দেখিয়া আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে। কে এই অন্নসত্র দিয়াছেন ? রুক্মিণীকুমার কি তাঁহার নাম ?"

রক্ষকেরা বলিল, "একজন স্ত্রীলোক এই অন্নসত্র দিয়াছেন।"

দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ইহাকে 'রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ' বলে কেন ?"

রক্ষকেরা বলিল, "তাহা আমরা কেহ জানি না।"

"রুক্মিণীকুমার কাহার নাম ?"

"কাহারও নয়।"

"যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার নিবাস কোথায় ?"

রক্ষকেরা সম্মুখে অতি বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তোমরা যাঁহার বাড়ী দেখাইয়া দিলে, তিনি পুরুষমানুষের সাক্ষাতে বাহির হইয়া

থাকেন ? রাগ করিও না, এখন অনেক বড়মানুষের মেয়ে মেম লোকের মত বাহিরে বাহির হইয়া থাকে, এই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

রক্ষকেরা উত্তর করিল—"ইনি সেরূপ চরিত্রের নন। পুরুষের সমক্ষে বাহির হন না।"

প্রশ্নকর্ত্তা ধীরে-ধীরে রাধারাণীর অট্টালিকার অভিমুখে গিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচ্ছদ সচরাচর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মত, বিশেষ পারিপাট্য, অথবা পারিপাট্যের বিশেষ অভাবও কিছু ছিল না; কিন্তু তাঁহার অঙ্গুলীতে একটি হীরকাঙ্গুরীয় ছিল; তাহা দেখিয়া রাধারাণীর কর্ম্মকারকগণ অবাক্ হইয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল, এত বড় হীরা তাহারা কখন অঙ্গুরীয়ে দেখে নাই। তাঁহার সঙ্গে কোন লোক ছিল না, এজন্য তাহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না যে, কে ইনি? মনে করিল, বাবু স্বয়ং পরিচয় দিবেন। কিন্তু বাবু কোন পরিচয় দিলেন না। তিনি রাধারাণীর দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিলেন। বলিলেন, "এই পত্র আপনার মুনিবের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, আমাকে উত্তর আনিয়া দিন।"

দেওয়ানজী বলিলেন, "আমার মুনিব স্ত্রীলোক; এজন্য তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন অপরিচিত লোকে পত্র আনিলে আমরা তাহা না পড়িয়া তাঁহার কাছে পাঠাইব না।"

আগন্তুক বলিলেন, "আপনি পড়ুন।"

দেওয়ানজী পত্র পড়িলেনঃ

"প্রিয় ভগিনী!

এ ব্যক্তি পুরুষ হইলেও, ইহার সহিত তুমি গোপনে সাক্ষাৎ করিও—ভয় করিও না। যেমত ঘটে আমাকে লিখিও।

শ্রীমতী বসন্তকুমারী।"

কামাখ্যাবাবুর কন্যার স্বাক্ষর দেখিয়া, কেহ আর কিছু বলিল না। পত্র অন্তঃপুরে গেল। অন্তঃপুর হইতে পরিচারিকা, পত্রবাহক বাবুকে লইতে আসিল। আর কেহ সঙ্গে যাইতে পাইল না—হুকুম নাই।

পরিচারিকা, বাবুকে লইয়া এক সুসজ্জিত গৃহে বসাইল। রাধারাণীর অন্তঃপুরে সেই প্রথম পুরুষমানুষ প্রবেশ করিল। দেখিয়া একজন পরিচারিকা রাধারাণীকে ডাকিতে গেল, আর-একজন অন্তরালে থাকিয়া আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল যে, তাঁহার বর্ণটুকু গৌর, স্ফুটিত মল্লিকা-রাশির মত গৌর, তাঁহার শরীর দীর্ঘ, ঈষৎ স্থূল; কপাল দীর্ঘ, অতি সূক্ষ্ম, পরিষ্কার ঘনকৃষ্ণ সুরঞ্জিত কেশজালে মণ্ডিত; চক্ষু বৃহৎ, কটাক্ষ স্থির, ভ্রূযুগ সূক্ষ্ম, ঘন, দূরায়ত এবং নিবিড় কৃষ্ণ; নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত; ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ, ক্ষুদ্র এবং কোমল; গ্রীবা দীর্ঘ, অথচ মাংসল; অন্যান্য অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কেবল অঙ্গুলীগুলি দেখা যাইতেছে, সেগুলি শুভ্র, সুগঠিত, এবং একটি বৃহদাকার হীরকে রঞ্জিত।

রাধারাণী সেই স্থানে আসিয়া পরিচারিকাকে বিদায় করিয়া দিলেন। রাধারাণী আসিবামাত্র দর্শকের বোধ হইল যে, সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব সূর্য্যোদয় হইল—রূপের আলোকে তাঁহার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আগন্তুকের উচিত প্রথম কথা কহা—কেন না তিনি পুরুষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ—কিন্তু তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাধারাণী একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি এরূপভাবে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছেন কেন?"

আগন্তুক একখানি পুরাতন সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহা রাধারাণীকে দেখাইলেন। রাধারাণী পড়িলেন; কামাখ্যাবাবুর স্বাক্ষরিত রুক্মিণীকুমার সম্বন্ধে সেই বিজ্ঞাপন। রাধারাণী দাঁড়াইয়াছিলেন—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নারিকেলপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। আগন্তুকের দেবতুল্য গঠন দেখিয়া, মনে ভাবিলেন, ইনিই আমার সেই রুক্মিণীকুমার। আর থাকিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "আপনার নাম কি রুক্মিণীকুমারবাবু?"

আগন্তুক বলিলেন "না।"



...মালা কেহ কিনিল না। সন্ধ্যা হইল, রাত্রি হইল...অগত্যা রাধারাণী বৃষ্টিতে ভিজিতে-ভিজিতে কাঁদিতে-কাঁদিতে ফিরিল।

"না" শব্দ শুনিয়াই রাধারাণী ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—তাঁহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া গেল।

আগন্তুক বলিলেন, "না, আমি যদি রুক্মিণীকুমার হইতাম, তাহা হইলে কামাখ্যাবাবু এ বিজ্ঞাপন দিতেন না। কেন না, তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু যখন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তখনই আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।"

রাধারাণী বলিলেন, "যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের কোন সম্বন্ধ নাই, তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন কেন?"

উত্তরকারী বলিলেন, "একটি কৌতূহলের জন্য। আজ আট-দশ বৎসর হইল, আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম—কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে আপনার নামটা গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিতাম। কাল্পনিক নাম রুক্মিণীকুমার। আপনি অত বিমনা হইতেছেন কেন?"

রাধারাণী একটু স্থির হইলেন—আগন্তুক বলিতে লাগিলেন—"যথার্থ রুক্মিণীকুমার নাম ধরে, এমন কাহাকেও চিনি না। যদি কেহ আমারই তল্লাস করিয়া থাকে—তাহা সম্ভব নহে—তথাপি কি জানি সাত-পাঁচ ভাবিয়া বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিলাম। কিন্তু কামাখ্যাবাবুর কাছে আসিতে সাহস হইল না।"

"পরে?"

"পরে কামাখ্যাবাবুর শ্রাদ্ধে তাঁহার পুত্রগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু আমি কার্য্যগতিকে আসিতে পারি নাই। সম্প্রতি সে ত্রুটির ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাঁহার পুত্রদিগের নিকট আসিলাম। কৌতূহলবশতঃ বিজ্ঞাপন সঙ্গে আনিয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে উহার কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যাবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হইয়াছিল? কামাখ্যাবাবুর পুত্র বলিলেন যে, রাধারাণীর অনুরোধে। আমিও এক রাধারাণীকে চিনিতাম—এক বালিকা—আমি এক দিন দেখিয়া তাহাকে আর

ভুলিতে পারিলাম না। সে মাতার পথ্যের জন্য, আপনি অনাহারে থাকিয়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া—সেই অন্ধকার বৃষ্টিতে—” বক্তা আর কথা কহিতে পারিলেন না—তাঁহার চক্ষু জলে পুরিয়া গেল। রাধারাণীরও চক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল। চক্ষু মুছিয়া রাধারাণী বলিলেন, “ইতর লোকের কথায় এখন প্রয়োজন কি? আপনার কথা বলুন।”

আগন্তুক উত্তর করিলেন, “রাধারাণী ইতর লোক নহে। যদি সংসারে কেহ দেবকন্যা থাকে, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহাকে পবিত্র, সরলচিত্ত এ সংসারে আমি দেখিয়া থাকি, তবে সেই রাধারাণী —যদি কাহারও কথায় অমৃত থাকে, তবে সেই রাধারাণী—যথার্থ অমৃত!” রুক্মিণীকুমার ঐসঙ্গে মনে-মনে বলিলেন, “আবার আজ বুঝি তেমনি কথা শুনিতেছি!”

এদিকে রাধারাণীও বিস্মিত হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন! কিন্তু আগন্তুকের কাছে নিজেকে ধরা না দিবার জন্য বহুকষ্টে অশ্রু-সম্বরণ করিয়া বলিলেন, “এতক্ষণ আপনি সেই ভিখারিণীর কথাই বলিলেন, কিন্তু আমাকে কেন দর্শন দিয়াছেন, তা ত এখনও বলেন নাই।”

রুক্মিণীকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “তাই বলিতে-ছিলাম। আমি সেই রাধারাণীকে চিনিতাম—রাধারাণীকে মনে পড়িল, একটু—এতটুকু—অন্ধকার রাত্রে জোনাকির ন্যায়—একটু আশা হইল যে, যদি এই রাধারাণী আমার সেই রাধারাণী হয়!”

রাধারাণী বলিলেন, “তারপর?”

রুক্মিণীকুমার বলিতে লাগিলেন, “সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কামাখ্যাবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘রাধারাণী কে? কামাখ্যাবাবুর পুত্র সবিস্তারে পরিচয় দিতে বোধ হয় অনিচ্ছুক ছিলেন। কেবল বলিলেন, ‘আমাদিগের কোন আত্মীয়ার কন্যা।’ যেখানে তাঁহাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম, সেখানে আর অধিক

পীড়াপীড়ি করিলাম না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রাধারাণী কেন রুক্মিণীকুমারের সন্ধান করিয়াছিলেন, শুনিতে পাই কি? যদি প্রয়োজন হয় ত বোধ করি আমি কিছু সন্ধান দিতে পারি।' আমি এই কথা বলিলে তিনি বলিলেন, 'রাধারাণী কেন রুক্মিণীবাবুকে খুঁজিতেছিলেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি না; আমার পিতৃঠাকুর জানিতেন; বোধ করি আমার ভগিনীও জানিতে পারেন। যেখানে আপনি সন্ধান দিতে পারেন বলিতেছেন, সেখানে আমার ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে হইতেছে।' এই বলিয়া তিনি উঠিলেন। প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র দিলেন, সে পত্র আপনাকে দিয়াছি। তিনি আমাকে সেই পত্র দিয়া বলিলেন, আমার ভগিনী সবিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না, কেবল এই পত্র দিলেন, আর বলিলেন যে, এই পত্র লইয়া তাঁহাকে স্বয়ং রাজপুরে যাইতে বলুন। রাজপুরে যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। আমি সেই পত্র লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। কোন অপরাধ করিয়াছি কি?"

রাধারাণী বলিলেন, "জানি না। বোধ হয় যে, আপনি মহাভ্রমে পতিত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন। আপনার রাধারাণী কে, তাহা আমি চিনি না, বলিতে পারিতেছি না। সে রাধারাণীর কথা কি, শুনিলে বলিতে পারি, আমা হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না।"

রুক্মিণীকুমার সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন, কেবল নিজদত্ত অর্থবস্ত্রের কথা কিছু বলিলেন না। রাধারাণী বলিলেন, "স্পষ্ট কথা মার্জ্জনা করিবেন। আপনাকে রাধারাণীর কোন কথা বলিতে সাহস হয় না; কেন না, আপনাকে দয়ালু লোক বোধ হইতেছে না। যদি আপনি সেরূপ দয়ার্দ্রচিত্ত হইতেন, তাহা হইলে আপনি যে ভিখারী বালিকার কথা বলিলেন, তাহাকে অমন দুর্দ্দশাপন্না দেখিয়া অবশ্য তার কিছু আনুকূল্য করিতেন।"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আনুকূল্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। আমি সেদিন নৌকাপথে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম—পাছে কেহ জানিতে পারে, এইজন্য ছদ্মবেশে রুক্মিণীকুমার রায় পরিচয়ে লুকাইয়া আসিয়াছিলাম—অপরাহ্নে ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে উঠিয়া আসিয়াছিলাম। সঙ্গে যাহা অল্প ছিল, তাহা রাধারাণীকেই দিয়াছিলাম; কিন্তু সে অতি সামান্য! পরদিন প্রাতে আসিয়া উহাদিগের বিশেষ সংবাদ লইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সে রাত্রে আমার পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তখনই আমাকে কাশী যাইতে হইল। পিতা অনেক দিন রুগ্ন হইয়া রহিলেন, কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিতে আমার বৎসরাধিক বিলম্ব হইল। বৎসর পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কুটীরের সন্ধান করিলাম—কিন্তু তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না।"

রাধা। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে। বোধ হয়, সেই রথের দিন, নিরাশ্রয়ে, বৃষ্টি-বাদলে আপনাকে সেই কুটীরেই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। আপনি কতক্ষণ সে কুটীরে অবস্থিতি করিলেন?

রু। অধিকক্ষণ নহে। আমি যাহা রাধারাণীর হাতে দিয়াছিলাম, তাহা দেখিবার জন্য রাধারাণী আলো জ্বালিতে গেল—আমি সেই অবসরে তাহার বস্ত্র কিনিতে চলিয়া আসিলাম।

রাধা। আর কি দিয়া আসিলেন?

রু। আমি কি দিব? একখানি ক্ষুদ্র নোট ছিল, তাহা কুটীরে রাখিয়া আসিলাম।

রাধা। নোটখানি ওরূপে দেওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই—তাহারা মনে করিতে পারে, আপনি নোটখানি হারাইয়া গিয়াছেন।

রু। না, আমি পেন্সিলে লিখিয়া দিয়াছিলাম, "রাধারাণীর জন্য"। তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম 'রুক্মিণীকুমার রায়'।

যদি সেই রুক্মিণীকুমারকে সেই রাধারাণী অন্বেষণ করিয়া থাকে, এই ভরসায় বিজ্ঞাপনটি তুলিয়া রাখিয়াছিলাম।

রাধা। তাই বলিতেছিলাম, আপনাকে দয়ার্দ্রচিত্ত বলিয়া বোধ হয় না। যে রাধারাণী আপনার শ্রীচরণ দর্শন জন্য—এইটুকু বলিতেই তাঁহার চোখের জল ঝরঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। অমনই মাথার কাপড়টা বেশী করিয়া টানিয়া দিয়া সে ঘর হইতে রাধারাণী বাহির হইয়া গেলেন।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাহিরে আসিয়া মুখ-চোখে জল দিয়া অশ্রুচিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া রাধারাণী ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "ইনি ত রুক্মিণীকুমার। আমিও সেই রাধারাণী। দুইজনে দুইজনের জন্য মন তুলিয়া রাখিয়াছি। এখন উপায়? আমি যে রাধারাণী, তা উহাকে বিশ্বাস করাইতে পারি--তার পর? উনি কি জাতি, তা কে জানে। জাতিটা এখনই জানিতে পারা যায়। কিন্তু উনি যদি আমার জাতি না হন! তবে ধর্ম্মবন্ধন ঘটিবে না।"

আবার ভাবিতে লাগিলেন, "আচ্ছা! যদি আমার জাতিই হন, তা হলেই বা ভরসা কি? উনি ত দেখিতেছি বয়ঃপ্রাপ্ত-কুমার, এমন সম্ভাবনা কি? তা হলেনই বা বিবাহিত? না! না! তা হইবে না। নাম জপ করিয়া মরি সে অনেক ভাল—সতীন সহিতে পারিব না।"

"তবে এখন কর্ত্তব্য কি? জাতির কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই বা কি হইবে? তবে রাধারাণীর পরিচয়টা দিই। আর উনি কে; তাহা জানিয়া লই; কেন না; রুক্মিণীকুমার ত ওঁর নাম নয়—তা ত শুনিলাম।"

এই ভাবিয়া রাধারাণী, যাহা প্রাণের অধিক যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বাহির করিয়া আনিলেন। সে সেই নোটখানি; বলিয়াছি, রাধারাণী তাহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। রাধারাণী তাহা আঁচলে বাঁধিলেন এবং ধীরে ধীরে রুক্মিণীকুমারের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

———

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাধারাণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রুক্মিণীকুমার তখন বলিলেন, "আপনি আমাকে বিদায় দিয়াও যান নাই, আমি যে-কথা জানিবার জন্য আসিয়াছি, তাহাও জানিতে পারি নাই। তাই এখনও যাই নাই।"

রাধা। আপনি রাধারাণীর জন্য আসিয়াছেন, তাহা আমারও মনে আছে। এ বাড়ীতে একজন রাধারাণী আছে, সত্য বটে। সে আপনার নিকট পরিচিত হইবে কি না, সেই কথাটা ঠিক করিতে গিয়াছিলাম।

রু। তারপর?

রাধারাণী তখন অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বলিয়াছেন, রুক্মিণীকুমার আপনার যথার্থ নাম নহে। রাধারাণীর যে আরাধ্য দেবতা, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত এখনও সে শুনিতে পায় নাই।"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আরাধ্য দেবতা, কে বলিল?"

রাধারাণী কথাটা অনবধানে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, এখন সামলাইতে গিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "নাম ঐরূপে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।"

রুক্মিণীকুমার বলিলেন, "আমার নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।"

রাধা। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের নাম শুনিয়াছি।

দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "অমন সকলেই রাজা কবলায়। আমাকে যে কুমার বলে, সে যথেষ্ট সম্মান করে।"

রাধা। এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল। জানিলাম যে, আপনি আমার স্বজাতি। এখন স্পর্দ্ধা হইতেছে, আজ আপনাকে আমার আতিথ্য স্বীকার করাই।

দেবেন্দ্র। সে-কথা পরে হবে। রাধারাণী কৈ?

রা। ভোজনের পর সে কথা বলিব।

দে। মনে দুঃখ থাকিলে ভোজনে তৃপ্তি হয় না।

রা। রাধারাণীর জন্য এত দুঃখ? কেন?

দে। তা জানি না, বড় দুঃখ—আট বৎসরের দুঃখ, তাই জানি!

রা। হঠাৎ রাধারাণীর পরিচয় দিতে আমার কিছু সঙ্কোচ হইতেছে। আপনি রাধারাণীকে পাইলে কি করিবেন?

দে। কি আর করিব? একবার দেখিব।

রা। একবার দেখিবার জন্য এই আট বৎসর এত কাতর?

দে। রকম রকমের মানুষ থাকে।

রা। আচ্ছা, আমি ভোজনের পরে আপনাকে আপনার রাধারাণী দেখাইব। ঐ বড় আয়না দেখিতেছেন, উহার ভিতর দেখাইব। চাক্ষুষ দেখিতে পাইবেন না।

দে। চাক্ষুষ সাক্ষাতেই বা কি আপত্তি?

রা। সে কুলের কুলবতী!

দে। আপনিও ত তাই।

রা। আমার কিছু বিষয় আছে। নিজে তাহার তত্ত্বাবধান করি। সুতরাং সকলের সমুখেই আমাকে বাহির হইতে হয়। আমি কাহারও অধীন নই। সে তাহার স্বামীর অধীন, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত—

দে। স্বামী!

রা। হ্যাঁ! আশ্চর্য্য হলেন যে?

দে। বিবাহিতা।

রা। হিন্দুর মেয়ে—উনিশ বৎসর বয়স, বিবাহিতা নহে?

দেবেন্দ্রনারায়ণ অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া রহিলেন। রাধারাণী বলিলেন, "কেন, আপনি কি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন?"

দে। মানুষ কি না ইচ্ছা করে?

রা। এরূপ ইচ্ছা রাণীজি জানিতে পারিয়াছেন কি?

দে। রাণীজি কেহ ইহার ভিতর নাই। রাধারাণী-সাক্ষাতের অনেক পূর্ব্বেই আমার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে।

রাধারাণী আবার যুক্তকরে ডাকিলেন, "জয় জগদীশ্বর! আর ক্ষণকাল যেন আমার এমনই সাহস থাকে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তা, শুনিলেন ত রাধারাণী পরস্ত্রী। এখনও কি তাহার দর্শন অভিলাষ করেন?"

দে। করি বই কি।

রা। সে কথাটা কি আপনার যোগ্য?

দে। রাধারাণী আমার সন্ধান করিয়াছিল কেন, তাহা এখনও আমার জানা হয় নাই।

রা। আপনি রাধারাণীকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ করিবে বলিয়া। আপনি শোধ লইবেন কি?

দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "যা দিয়াছি, তাহা পাইলে লইতে পারি।"

রা। কি কি দিয়াছেন?

দে। একখানা নোট।

রা। এই নিন।

বলিয়া রাধারাণী আঁচল হইতে সেই নোটখানি খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের হাতে দিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন, তাঁহার হাতে লেখা রাধারাণীর নাম সে নোটে আছে। দেখিয়া বলিলেন, "এ নোট কি রাধারাণীর স্বামী কখনও দেখিয়াছেন?"

রা। রাধারাণী কুমারী। স্বামীর কথাটা আপনাকে মিথ্যা বলিয়াছিলাম।

দে। তা, সব ত শোধ হইল না।

রা। আর কি বাকি?

দে। দুইটি টাকা, আর কাপড়।

রা। সব ঋণ যদি এখন পরিশোধ হয়, তবে আপনি আহার না করিয়া চলিয়া যাইবেন। পাওনা বুঝিয়া পাইলে কোন্ মহাজন বসে? ঋণের সে অংশ ভোজনের পর রাধারাণী পরিশোধ করিবে।

এই বলিয়া রাধারাণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাধারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, দেওয়ানজি আসিয়া রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে বহির্ব্বাটীতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন। যথাবিহিত সময়ে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ভোজন করিলেন। রাধারাণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে রাধারাণী বলিলেন, "আপনার নগদ দুইটি টাকা ও কাপড় এখনও ধারি। কাপড় পরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। টাকা খরচ করিয়াছি। তাহা আর ফেরত দিবার যো নাই। তাহার বদলে যাহা আপনার জন্য রাখিয়াছি, তাহা গ্রহণ করুন।"

এই বলিয়া রাধারাণী বহুমূল্য হীরকহার বাহির করিয়া দেবেন্দ্রের গলায় পরাইয়া দিতে গেলেন।

দেবেন্দ্রনারায়ণ নিষেধ করিয়া বলিলেন, "যদি ঐরূপে দেনা পরিশোধ করিবে, তবে তোমার গলায় যে ছড়া আছে, তাহাই লইব।"

রাধারাণী হাসিতে-হাসিতে আপনার গলার হার খুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের গলায় পরাইলেন। তখন দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সব শোধ হইল—কিন্তু আমি একটু ঋণী রহিলাম।"

রাধা। কিসে ?

দে। সেই দুই পয়সার ফুলের মালার মূল্য ত ফেরত পাইলাম। তবে এখন মালা ফেরত দিতে আমি বাধ্য।

রাধারাণী হাসিলেন।

দেবেন্দ্রনারায়ণ ইচ্ছাপূর্ব্বক মুক্তাহার পরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা রাধারাণীর কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই ফেরত দিলাম।"

এই সময়ে পোঁ করিয়া শাঁখ বাজিল।

রাধারাণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাঁখ বাজাইল কে ?"

তাঁহার একজন দাসী, চিত্রা উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আমি।"

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, বাজাইলি ?"

চিত্রা বলিল, "কিছু পাইব বলিয়া।"

বলা বাহুল্য যে, চিত্রা পুরস্কৃত হইল। কিন্তু তাহার কথাটা মিথ্যা। রাধারাণী তাহাকে শিখাইয়া-পড়াইয়া দ্বারের নিকট বসাইয়া আসিয়াছিলেন।

তার পরে দুইজনে বিরলে বসিয়া মনের কথা হইল। রাধারাণী দেবেন্দ্রনারায়ণের বিস্ময় দূর করিবার জন্য, সেই রথের দিনের সাক্ষাতের পর যাহা-যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার পিতামহের বিষয়-সম্পত্তির কথা, পিতামহের উইল লইয়া মোকদ্দমার কথা, তজ্জন্য রাধারাণীর মার দৈন্যের কথা, মার মৃত্যুর কথা, কামাখ্যাবাবুর আশ্রয়ের কথা, প্রিবিকৌন্সিলের ডিক্রীর কথা, কামাখ্যাবাবুর মৃত্যুর কথা, সব বলিল। বসন্তের কথা বলিল, আপনার বিজ্ঞাপনের কথা বলিল।

দেবেন্দ্রনারায়ণ তখন রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ত কেহ নাই। কিন্তু এ বাড়ী বড় জনাকীর্ণ দেখিতেছি।"

রাধারাণী বলিলেন, "দুঃখের দিনে আমার কেহ ছিল না। এখন আমার অনেক আত্মীয়কুটুম্ব জুটিয়াছে। আমি এ অল্প বয়সে একা থাকিতে পারি না, এজন্য যত্ন করিয়া তাহাদিগকে স্থান দিয়া রাখিয়াছি।"

দে। তাঁহাদের মধ্যে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট কেহ আছেন যে, তোমাকে এই দীন-দরিদ্রকে দান করিতে পারেন ?

রা। তাও আছে।

দে। তবে তিনি কেন সেই শুভলগ্নযুক্ত সুতহিবুক যোগটা খুঁজুন না ?

রা। বোধ করি, এতক্ষণ সে কাজটা হইয়া গেল। তোমার সহিত রাধারাণীর এরূপ সাক্ষাৎ অন্য কোন কারণে হইতে পারে না, এ পুরীতে সকলেই জানে। সংবাদ লইব কি ?

দে। বিলম্বে কাজ কি ?

রাধারাণী ডাকিলেন, "চিত্রে !"

চিত্রা আসিল।

রাধারাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিন-টিন কিছু হইল কি?"

চিত্রা বলিল, "হ্যাঁ, দেওয়ানজি মহাশয় পুরোহিত মহাশয়কে ডাকাইয়াছিলেন। পুরোহিত পরদিন বিবাহের উত্তম দিন বলিয়া গিয়াছেন। দেওয়ানজি মহাশয় সমস্ত উদ্যোগ করিতেছেন।"

তখন বসন্ত আসিল, কামাখ্যাবাবুর পুত্রেরা এবং পরিবারবর্গ সকলেই আসিল, আর যত বসন্তের কোকিল, সময়ের বন্ধু যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিল। দেবেন্দ্রনারায়ণের বন্ধু ও অনুচরবর্গ সকলে আসিল।

বসন্ত আসিলে রাধারাণী কহিলেন, "কি আক্কেল ভাই বসন্ত?"

বসন্ত। কি আক্কেল ভাই রাধারাণী?

রা। যাকে তাকে তুমি পত্র দিয়া পাঠাইয়া দাও কেন?

বসন্ত। কেন, লোকটা কি করেছে বল দেখি?

রাধারাণী তখন সকল বলিলেন। বসন্ত বলিলেন, "রাগের কথা ত বটে। সুদসুদ্ধ দেনাপাওনা বুঝিয়ে নেয়, এমন মহাজনকে যে বাড়ী চিনাইয়া দেয়, তাহার উপর রাগের কথাটা বটে।"

রাধারাণী বলিলেন, "তাই আজ আমি তোর গলায় দড়ি দিব!"

এই বলিয়া রাধারাণী যে হীরকহার রুক্মিণীকুমারকে পরাইতে গিয়াছিলেন, তাহা আনিয়া বসন্তের গলায় পরাইয়া দিলেন।

তারপর শুভলগ্নে শুভবিবাহ হইয়া গেল।

———

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের



ইন্দিরা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিত

ইন্দিরা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি শ্বশুরবাড়ী যাইব

অনেক দিনের পর আমি শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলাম। আমি উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্য্যন্ত শ্বশুরের ঘর করি নাই। তাহার কারণ, আমার পিতা ধনী, শ্বশুর দরিদ্র। বিবাহের কিছুদিন পরেই শ্বশুর আমাকে লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা পাঠাইলেন না; বলিলেন, বিহাইকে বলিও যে, আগে আমার জামাতা উপার্জ্জন করিতে শিখুক—তারপর বধূ লইয়া যাইবেন—এখন আমার মেয়ে লইয়া গিয়া কি খাওয়াইবেন? শুনিয়া আমার স্বামীর মনে বড় ঘৃণা জন্মিল—তাঁহার বয়স তখন কুড়ি বৎসর, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, স্বয়ং অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিব। এই ভাবিয়া তিনি পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। তখন রেইল হয় নাই—পশ্চিমের পথ অতি দুর্গম ছিল। তিনি পদব্রজে, বিনা অর্থে, বিনা সহায়ে, সেই পথ অতিবাহিত করিয়া পাঞ্জাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে ইহা পারে, সে অর্থোপার্জ্জন করিতেও পারে। স্বামী অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন—কিন্তু সাত-আট বৎসর বাড়ী আসিলেন না, বা আমার কোন সংবাদ লইলেন না। রাগে আমার শরীর গর্‌গর্‌ করিত। কত টাকা চাই? পিতামাতার উপর বড় রাগ হইত—কেন পোড়া টাকা উপার্জ্জনের কথা তাঁহারা তুলিয়াছিলেন? টাকা কি আমার সুখের চেয়ে বড়! আমার বাপের ঘরে অনেক টাকা—আমি টাকা লইয়া "ছিনিমিনি" খেলিতাম। মনে করিতাম, এক

দিন টাকা পাতিয়া শুইয়া দেখিব—কি সুখ? একদিন মাকে বলিলাম, "মা, টাকা পাতিয়া শুইব।"

মা বলিলেন, "পাগ্‌লী কোথাকার!" মা কথাটা বুঝিলেন। কি কল কৌশল করিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু যে সময়ের ইতিহাস আরম্ভ করিতেছি, তাহার কিছু পূর্ব্বে আমার স্বামী বাড়ী আসিলেন।

রব উঠিল যে, তিনি সরকারী চাকুরী করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া আসিয়াছেন। আমার শ্বশুর আমার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে উপেন্দ্র বধূমাতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম। পাল্কী-বেহারা পাঠাইলাম, বধূমাতাকে এ বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন, নচেৎ আজ্ঞা করিলে পুত্রের বিবাহের আবার সম্বন্ধ করিব।"

পিতা দেখিলেন, নূতন বড়মানুষ বটে। পাল্কীখানার ভিতরে কিংখাপ মোড়া, উপরে রূপার বিট, বাঁটে রূপার হাঙ্গরের মুখ। দাসী যে আসিয়াছিল, সে গরদ পরিয়া আসিয়াছে, গলায় বড় মোটা সোনার দানা। চারি জন কালো দাড়িওয়ালা ভোজপুরে পাল্কীর সঙ্গে আসিয়াছিল।

আমার পিতা বুনিয়াদি বড়মানুষ, হাসিয়া বলিলেন, "মা ইন্দিরে! আর তোমাকে রাখিতে পারি না। এখন যাও, আবার শীঘ্র লইয়া আসিব। আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া হাসিও না।"

মনে মনে বাবার কথার উত্তর দিলাম, বলিলাম, "আমার প্রাণটা বুঝি আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল; তুমি যেন বুঝিতে পারিয়া হাসিও না।"

আমার ছোট বহিন কামিনী বুঝি তা বুঝিতে পারিয়াছিল-- বলিল, "দিদি! আবার আসিবে কবে?" আমি তাহার গাল টিপিয়া ধরিলাম।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্বশুরবাড়ী চলিলাম

আমার শ্বশুরবাড়ী মনোহরপুর। আমার পিত্রালয় মহেশপুর। উভয় গ্রামের মধ্যে দশ ক্রোশ পথ, সুতরাং প্রাতে আহার করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, পৌঁছিতে পাঁচ-সাত দণ্ড রাত্রি হইবে জানিতাম।

পথে কালাদীঘি নামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তাহার জল প্রায় আধক্রোশ। পাড় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। তাহার ভিতর দিয়া পথ। চারিপার্শ্বে বটগাছ। তাহার ছায়া শীতল, দীঘির জল নীল মেঘের মত, দৃশ্য অতি মনোহর। তথায় মনুষ্যের সমাগম বিরল। ঘাটের উপরে একখানি দোকান আছে মাত্র। নিকটে যে গ্রাম আছে, তাহারও নাম কালাদীঘি।

এই দীঘিতে লোকে একা আসিতে ভয় করিত। দস্যুতার ভয়ে এখানে দলবদ্ধ না হইয়া লোক আসিত না। এইজন্য লোকে 'ডাকাতে-কালাদীঘি' বলিত। দোকানদারকে লোকে দস্যুদিগের সহায় বলিত। আমার সে সকল ভয় ছিল না। আমার সঙ্গে অনেক লোক—যোল জন বাহক, চারিজন দ্বারবান্ এবং অন্যান্য লোক ছিল।

যখন আমরা এইখানে পৌঁছিলাম, তখন বেলা আড়াই প্রহর। বাহকেরা বলিল যে, "আমরা কিছু জল-টল না খাইলে আর যাইতে পারি না।" দ্বারবানেরা বারণ করিল, বলিল, "এ স্থান ভাল নয়।"

বাহকেরা উত্তর করিল, "আমরা এত লোক আছি—আমাদিগের ভয় কি?" আমার সঙ্গের লোকজন ততক্ষণ কেহই কিছুই খায় নাই। শেষে সকলেই বাহকদিগের মতে মত করিল।

দীঘির ঘাটে—বটতলায় আমার পাল্কী নামাইল। আমি হাড়ে জ্বলিয়া গেলাম। কোথায় কেবল ঠাকুর-দেবতার কাছে মানিতেছি, শীঘ্র পৌঁছি;—কোথায় বেহারা, পাল্কী নামাইয়া হাঁটু উঁচু করিয়া

ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল! কিন্তু ছি! স্ত্রীজাতি বড় আপনার বুঝে! আমি যাইতেছি কাঁধে, তাহারা কাঁধে আমাকে বহিতেছে; আমি যাইতেছি স্বামিসন্দর্শনে—তারা যাইতেছে খালি পেটে এক মুঠা ভাতের সন্ধানে; তারা একটু ময়লা গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছে বলিয়া কি আমার রাগ হইল!

এই ভাবিতে ভাবিতে আমি ক্ষণেক পরে, অনুভবে বুঝিলাম যে, লোকজন তফাৎ গিয়াছে। আমি তখন সাহস পাইয়া অল্প দ্বার খুলিয়া দীঘি দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বাহকেরা সকলে দোকানের সম্মুখে এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া জলপান খাইতেছে। সেই স্থান আমার নিকট হইতে প্রায় দেড় বিঘা। দেখিলাম যে, সম্মুখে অতি নিবিড় মেঘের ন্যায় বিশাল দীর্ঘিকা বিস্তৃত রহিয়াছে। চারি-পার্শ্বে পাহাড়, এবং জলের মধ্যে বিস্তৃত ভূমিতে দীর্ঘ বটবৃক্ষ শ্রেণী। দেখিতে পাইলাম, আমার দ্বারবানেরা জলে নামিয়া স্নান করিতেছে।

আকাশপানে চাহিয়া দেখিলাম, কি সুন্দর নীলিমা!

আবার সরোবর প্রতি চাহিয়া দেখিলাম—এবার একটু ভীত হইলাম, দেখিলাম যে বাহকেরা ভিন্ন আমার সঙ্গের লোক সকলেই এককালে স্নানে নামিয়াছে। সঙ্গের স্ত্রীলোক—একজন শ্বশুরবাড়ীর, একজন বাপের বাড়ীর, উভয়েই জলে। আমার মনে একটু ভয় হইল —কেহ নিকটে নাই—স্থান মন্দ, ভাল করে নাই। কি করি, আমি কুলবধূ, মুখ ফুটিয়া কাহাকেও ডাকিতে পারিলাম না।

এমন সময়ে পাল্কীর অপরপার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। যেন উপরিস্থ বটবৃক্ষের শাখা হইতে কিছু গুরু পদার্থ পড়িল। আমি সে দিকের কবাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, একজন কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য! ভয়ে দ্বার বন্ধ করিলাম; কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, এ-সময়ে দ্বার খুলিয়া রাখাই ভাল। কিন্তু আমি পুনশ্চ দ্বার খুলিবার পূর্ব্বেই আর-একজন মানুষ গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। দেখিতে-দেখিতে আর একজন। এইরূপ চারিজন প্রায় এককালেই গাছ হইতে পড়িয়া পাল্কী কাঁধে করিয়া উঠাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

দেখিতে পাইয়া আমার দ্বারবানেরা "কোন্ হ্যায় রে! কোন্ হ্যায় রে!" রব তুলিয়া জল হইতে দৌড়িল।

তখন বুঝিলাম যে, আমি দস্যুহস্তে পড়িয়াছি। তখন আর লজ্জায় কি করে? পাল্কীর উভয় দ্বার মুক্ত করিলাম। আমি লাফাইয়া পড়িয়া পলাইব মনে করিলাম, কিন্তু দেখিলাম যে, আমার সঙ্গের লোক অত্যন্ত কোলাহল করিয়া পাল্কীর পিছনে দৌড়াইল। অতএব ভরসা হইল। কিন্তু শীঘ্রই সে ভরসা দূর হইল। তখন নিকটস্থ অন্যান্য বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বহুসংখ্যক দস্যু দেখা দিতে লাগিল। আমি বলিয়াছি, জলের ধারে বটবৃক্ষের শ্রেণী। সেই সকল বৃক্ষের নীচে দিয়া দস্যুরা পাল্কী লইয়া যাইতেছিল। সেই সকল বৃক্ষ হইতে মনুষ্য লাফাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের কাহারও হাতে বাঁশের লাঠি, কাহারও হাতে গাছের ডাল।

লোকসংখ্যা অধিক দেখিয়া আমার সঙ্গের লোকেরা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আমি নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া মনে করিলাম, লাফাইয়া পড়ি। কিন্তু বাহকেরা যেরূপ দ্রুতবেগে যাইতেছিল—তাহাতে পাল্কী হইতে নামিলে আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষতঃ একজন দস্যু আমাকে লাঠি দেখাইয়া বলিল যে, "নামিবি ত মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

আমি দেখিতে লাগিলাম যে, একজন দ্বারবান্ অগ্রসর হইয়া আসিয়া পাল্কী ধরিল। তখন একজন দস্যু তাহাকে লাঠির আঘাত করিল। সে অচেতন হইয়া মাটীতে পড়িল। তাহাকে আর উঠিতে দেখিলাম না। বোধ হয়, সে আর উঠিল না।

ইহা দেখিয়া অবশিষ্ট রক্ষিগণ নিরস্ত হইল। বাহকেরা আমাকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া গেল। রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত তাহারা এইরূপ বহন করিয়া পরিশেষে পাল্কী নামাইল। দেখিলাম, যেখানে নামাইল, সে স্থান নিবিড় বন—অন্ধকার। দস্যুরা একটা মশাল জ্বালিল। তখন আমাকে কহিল, "তোমার যাহা কিছু আছে, দাও—নহিলে প্রাণে মারিব।"

আমার অলঙ্কার বস্ত্রাদি সকল দিলাম,—অঙ্গের অলঙ্কারও খুলিয়া দিলাম। কেবল হাতের বালা খুলিয়া দিই নাই—তাহারা কাড়িয়া লইল। তাহারা একখানি মলিন, জীর্ণ বস্ত্র দিল, তাহা পরিয়া পরিধানের বহুমূল্য বস্ত্র ছাড়িয়া দিলাম। দস্যুরা আমার সর্ব্বস্ব লইয়া পাল্কী ভাঙ্গিয়া রূপা খুলিয়া লইল। পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া ভগ্ন শিবিকা দাহ করিয়া দস্যুতার চিহ্নমাত্র লোপ করিল।

তখন তাহারাও চলিয়া যায়, সেই নিবিড় অরণ্যে অন্ধকার রাত্রিতে আমাকে বন্যপশুদিগের মুখে সমর্পণ করিয়া যায় দেখিয়া আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি কহিলাম, "তোমাদিগের পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" দস্যুর সংসর্গও আমার স্পৃহণীয় হইল।

এক প্রাচীন দস্যু সকরুণভাবে বলিল, "বাছা, তোমাকে আমরা কোথায় লইয়া যাইব? এ ডাকাতির এখনই সোহরৎ হইবে—তোমার মত রাঙা মেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখিলেই আমাদের ধরিবে।"

একজন যুবা-দস্যু আমাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। তাহাতে দলের সর্দ্দার যুবাকে লাঠি দেখাইয়া কহিল, "এই বাড়িতে এইখানেই তোর মাথা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইব।"

তাহারা চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সুখ

এমনও কি কখনও হয়? এত বিপদ, এত দুঃখ কাহারও কখনও ঘটিয়াছে? কোথায় প্রথম স্বামিসন্দর্শনে যাইতেছিলাম, আর অকস্মাৎ এ কি বজ্রাঘাত! সর্ব্বালঙ্কার কাড়িয়া লইয়াছে—লউক; জীর্ণ মলিন দুর্গন্ধ বস্ত্র পরাইয়াছে—পরাক; বাঘ-ভালুকের মুখে সমর্পণ করিয়া গিয়াছে—যাক; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ যাইতেছে, তা যাক্—প্রাণ আর চাহি না, এখন গেলেই ভাল; কিন্তু যদি প্রাণ না যায়, যদি বাঁচি, তবে কোথায় যাইব? আর ত তাঁকে দেখা হইল না—বাপ-মাকেও বুঝি দেখিতে পাইব না! কাঁদিলে তা কান্না ফুরায় না।

তাই কাঁদিব না বলিয়া স্থির করিতেছিলাম। চক্ষুর জল কিছুতেই থামিতেছিল না, তবু চেষ্টা করিতেছিলাম—এমন সময় দূরে কি একটা বিকট গর্জ্জন হইল। মনে করিলাম, বাঘ। মনে একটু আহ্লাদ হইল। বাঘে খাইলে সকল জ্বালা জুড়ায়। হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া রক্ত শুষিয়া খাইবে, ভাবিলাম, তাও সহ্য করিব; শরীরের কষ্ট বৈ ত না। মরিতে পাইব, সেই পরম সুখ; অতএব কান্না বন্ধ করিয়া, একটু প্রফুল্ল হইয়া, স্থিরভাবে রহিলাম, বাঘের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পাতার যতবার ঘস্-ঘস্ শব্দ হয়, ততবার মনে করি ঐ সর্ব্বদুঃখহর প্রাণস্নিগ্ধকর বাঘ আসিতেছে। কিন্তু অনেক রাত্রি হইল তবুও বাঘ আসিল না। হতাশ হইলাম। তখন মনে হইল—যেখানে বড় ঝোপ-জঙ্গল, সেইখানে সাপ থাকিতে পারে। সাপের ঘাড়ে পা দিবার আশায় সেই জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিলাম, তাহার ভিতরে কত বেড়াইলাম। কত সর্-সর্ শব্দ শুনিলাম···কিন্তু কৈ? সাপে ত কামড়াইল না। আবার হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়াছিলাম—আর বেড়াইতে পারিলাম না। একটা পরিষ্কার

স্থান দেখিয়া বসিলাম। সহসা সম্মুখে এক ভালুক উপস্থিত হইল—মনে করিলাম, ভালুকের হাতেই মরিব, ভালুকটাকে তাড়া করিয়া মারিতে গেলাম, কিন্তু হায়! ভালুকটা আমায় কিছু বলিল না। সে গিয়া এক বৃক্ষের উপর উঠিল। বৃক্ষের উপর হইতে কিছু পরে ঝন্‌ঝন্ করিয়া সহস্র মক্ষিকার শব্দ হইল। বুঝিলাম, এই বৃক্ষে মৌচাক আছে, ভালুক জানিত; মধু লুঠিবার লোভে আমায় ত্যাগ করিল।

শেষ রাত্রিতে একটু নিদ্রা আসিল—বসিয়া-বসিয়া গাছে হেলান দিয়া আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এখন যাই কোথায় ?

যখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল তখন কাক কোকিল ডাকিতেছে। আলোতে প্রথমেই দেখিলাম, আমার হাতে কিছুই নাই, দস্যুরা সকলই কাড়িয়া লইয়াছে। বাঁ-হাতে একটুকরা লোহা আছে মাত্র।

তারপর চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে পাইলাম যে, আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, তাহার নিকটে অনেকগুলি গাছের ডাল কাটা, কোন গাছ সমূলে ছিন্ন, কেবল শিকড় পড়িয়া আছে। ভাবিলাম, এখানে কাঠুরিয়ারা আসিয়া থাকে। তবে গ্রামে যাইবার পথ আছে। দিবার আলোক দেখিয়া আবার বাঁচিবার ইচ্ছা হইয়াছিল,—আবার আশার উদয় হইয়াছিল ; উনিশ বৎসর বৈ ত নয়। সন্ধান করিতে করিতে একটা অতি অস্পষ্ট পথের রেখা দেখিতে পাইলাম। তাই ধরিয়া চলিলাম। যাইতে-যাইতে পথের রেখা আরও স্পষ্ট হইল, ভরসা হইল, গ্রাম পাইব।

কিন্তু আর ত চলিতে পারি না। কখনও চলা অভ্যাস নাই। তারপর সমস্ত রাত্রি জাগরণ, রাত্রির সেই অসহ্য মানসিক ও শারীরিক কষ্ট ; ক্ষুধা-তৃষ্ণা। আমি অবসন্ন হইয়া পথিপার্শ্বস্থ এক বৃক্ষতলে শুইয়া পড়িলাম। শুইবামাত্র নিদ্রাভিভূত হইলাম।

নিদ্রাভঙ্গে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। অনেক পথ হাঁটিয়া, একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পাইলাম। সে একটা গাই তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মহেশপুর কোথায় ? মনোহর-পুরই বা কোথায় ? প্রাচীনা বলিল, "মা, তুমি কে ? অমন সুন্দরী মেয়ে কি পথে-ঘাটে একা বেরুতে আছে ? তুমি আমার ঘরে আইস।"

তাহার ঘরে গেলাম। সে আমাকে ক্ষুধাতুরা দেখিয়া গাইটি দুইয়া একটু দুধ খাইতে দিল। সে মহেশপুর চিনিত। তাহাকে আমি বলিলাম যে, তোমাকে টাকা দেওয়াইব—তুমি আমাকে সেখানে রাখিয়া আইস।

তাহাতে সে কহিল যে, আমার ঘর-সংসার ফেলিয়া যাইব কি প্রকারে ?

তখন সে যে-পথ বলিয়া দিল, আমি সেই পথে গেলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পথ হাঁটিলাম, তাহাতে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইল। একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম "হ্যাঁ গা, মহেশপুর এখান হইতে কত দূর ?" সে আমাকে দেখিয়া স্তম্ভিতের মত রহিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?"

যে গ্রামে প্রাচীনা আমাকে পথ বলিয়া দিয়াছিল, আমি সেই গ্রামের নাম করিলাম। তাহাতে পথিক কহিল যে, "তুমি পথ ভুলিয়াছ, বরাবর উল্টা আসিয়াছ। মহেশপুর এখান হইতে এক দিনের পথ।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোথায় যাইবে ?"

সে বলিল, "আমি এই নিকটে গৌরীগ্রামে যাইব।"

আমি অগত্যা তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিলাম।

গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কাহার বাড়ী যাইবে ?"

আমি কহিলাম, "আমি এখানে কাহাকেও চিনি না। একটা গাছতলায় শয়ন করিয়া থাকিব।"

পথিক কহিল, "তুমি কি জাতি ?"

আমি কহিলাম, "আমি কায়স্থ।"

সে কহিল, "আমি ব্রাহ্মণ। তুমি আমার সঙ্গে আইস। তোমার ময়লা মোটা কাপড় বটে, কিন্তু তুমি বড়ঘরের মেয়ে। ছোটঘরে এমন রূপ হয় না।"

ছাই রূপ! ঐ রূপ রূপ শুনিয়া আমি জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিলাম ; কিন্তু এ ব্রাহ্মণ প্রাচীন, আমি তাঁহার সঙ্গে গেলাম।

আমি সে-রাত্রে ব্রাহ্মণের গৃহে দুই দিনের পর একটু বিশ্রাম লাভ করিলাম। সেই দয়ালু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাজক, পৌরোহিত্য করেন। আমার বস্ত্রের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার কাপড়ের এমন দশা কেন? তোমার কাপড় কি কেহ কাড়িয়া লইয়াছে?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ!"

তিনি যজমানদিগের নিকট অনেক কাপড় পাইতেন—দুইখানা খাটো বহরের চৌড়া রাঙ্গা পেড়ে সাড়ী আমাকে পরিতে দিলেন। শাঁখার কড়ও তাঁর ঘরে ছিল, তাহাও চাহিয়া লইয়া পরিলাম।

এইসকল কার্য্য সমাধা করিলাম—অতি কষ্টে। শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী দুটি ভাত দিলেন, খাইলাম। একটা মাদুর দিলেন, পাতিয়া শুইলাম।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম যে, আমার অত্যন্ত গা বেদনা হইয়াছে। পা ফুলিয়া উঠিয়াছে, বসিবার শক্তি নাই।

যত দিন-না গায়ের বেদনা আরাম হইল, তত দিন আমাকে কাজে কাজেই ব্রাহ্মণের গৃহে থাকিতে হইল। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গৃহিণী আমাকে যত্ন করিয়া রাখিলেন ; কিন্তু মহেশপুরে যাইবার কোন উপায় দেখিলাম না। কোন স্ত্রীলোকই পথ চিনিত না, অথবা যাইতে স্বীকার করিল না। পুরুষে অনেকেই স্বীকৃত হইল—কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে একাকিনী যাইতে ভয় করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণও নিষেধ করিলেন। বলিলেন, "উহাদের চরিত্র ভাল নহে ; উহাদের সঙ্গে যাইও না।"

সুতরাং আমি নিরস্ত হইলাম।

এক দিন শুনিলাম যে, ঐ গ্রামের কৃষ্ণদাস বসু নামক একজন ভদ্রলোক সপরিবারে কলকাতায় যাইবেন। শুনিয়া আমি উত্তম

সুযোগ বিবেচনা করিলাম। কলিকাতা হইতে আমার পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় অনেক দূর বটে, কিন্তু সেখানে আমার জ্ঞাতি খুল্লতাত বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন। আমি ভাবিলাম যে, কলিকাতায় গেলে অবশ্য খুল্লতাতের সন্ধান পাইব। তিনি অবশ্য আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। না হয় আমার পিতাকে সংবাদ দিবেন।

আমি এই কথা ব্রাহ্মণকে জানাইলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এ উত্তম বিবেচনা করিয়াছ, কৃষ্ণদাসবাবু আমার যজমান। সঙ্গে করিয়া লইয়া বলিয়া দিয়া আসিব। তিনি প্রাচীন, আর বড় ভাল মানুষ।"

ব্রাহ্মণ আমাকে কৃষ্ণদাসবাবুর কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এটি ভদ্রলোকের কন্যা, বিপাকে পড়িয়া পথ হারাইয়া এ-দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। আপনি যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান, তবে এ অনাথা আপন পিত্রালয়ে পৌছিতে পারে।"

কৃষ্ণদাসবাবু সম্মত হইলেন। পরদিন তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে আমি কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। প্রথম দিন, চারি-পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিতে হইল। পরদিন নৌকায় উঠিলাম।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাজিয়ে যাব মল

আমি গঙ্গা কখনও দেখি নাই। এখন গঙ্গা দেখিয়া আহ্লাদে প্রাণ ভরিয়া গেল, এত দুঃখ মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিলাম। গঙ্গা যথার্থ পুণ্যময়ী। অতৃপ্ত নয়নে কয়দিন দেখিতে দেখিতে আসিলাম।

যেদিন কলিকাতায় পৌঁছিব, তাহার পূর্ব্বদিন, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জোয়ার আসিল! নৌকা আর গেল না। একখানা ভদ্রগ্রামের একটা বাঁধা ঘাটের নিকট আমাদের নৌকা লাগাইয়া রাখিল। কত সুন্দর জিনিস দেখিলাম। জেলেরা মোচার খোলার মত ডিঙ্গীতে মাছ ধরিতেছে, দেখিলাম। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ঘাটের রাণায় বসিয়া শাস্ত্রীয় বিচার করিতেছেন, দেখিলাম। কত সুন্দরী বেশভূষা করিয়া জল লইতে আসিল। কেহ জল ফেলে, কেহ কলসী পূরে, কেহ আবার ঢালে, আবার কলসী পূরে আর হাসে, গল্প করে, আবার ফেলে, আবার কলসী ভরে। ঘাটে দুইটি মেয়ে দেখিলাম। ছোট মেয়ে। তাহাদের কখন ভুলিব না। মেয়ে দুইটির বয়স সাত-আট বৎসর। দেখিতে বেশ, তবে পরম সুন্দরীও নয়। কিন্তু সাজিয়াছিল ভাল। কানে দুল, হাতে ও গলায় এক-একখানা গহনা। ফুল দিয়া খোঁপা বেড়িয়াছে। রঙ-করা শিউলিফুলে ছোবানো দুইখানি কালাপেড়ে কাপড় পরিয়াছে। পায়ে চারিগাছি করিয়া মল আছে। কাঁকালে ছোট-ছোট দুটি কলসী আছে। তাহার ঘাটের রাণায় নামিবার সময় জোয়ারের জলের একটা গান গাহিতে-গাহিতে নামিল। গানটি মনে আছে, মিষ্ট লাগিয়াছিল, তাই এখানে লিখিলাম। একজন এক এক পদ গায়, আর একজন দ্বিতীয় পদ

গায়। তাহাদের নাম শুনিলাম, অমলা আর নির্ম্মলা। প্রথমে গায়িল,—

অমলা

ধানের ক্ষেতে, ঢেউ উঠেছে,
বাঁশতলাতে জল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

নির্ম্মলা

ঘাটটি জুড়ে, গাছটি বেড়ে,
ফুটল ফুলের দল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

অমলা

বিনোদ বেশে, মুচকে হেসে,
খুলব হাসির কল।
কলসী ধ'রে, গরব ক'রে,
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥

নৌকাপথে কলিকাতা আসিতে দূর হইতে কলিকাতা দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলাম। অট্টালিকার পর অট্টালিকা, বাড়ীর গায়ে বাড়ী, বাড়ীর পিঠে বাড়ী, তার পিঠে বাড়ী—অট্টালিকার সমুদ্র, তাহার অন্ত নাই, সংখ্যা নাই, সীমা নাই।

তখন মনে হইল, ইহার ভিতরে খুড়াকে খুঁজিয়া বাহির করিব কি প্রকারে?

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুবো

কৃষ্ণদাসবাবু কলিকাতায় কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন। ভবানীপুরে বাসা করিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খুড়ার বাড়ী কোথায়? কলিকাতায় না ভবানীপুরে?"

তাহা আমি জানিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলকাতায় কোন্ জায়গায় তাঁহার বাসা?"

তাহা আমি কিছুই জানিতাম না। আমি জানিতাম, যেমন মহেশপুর একখানি গণ্ডগ্রাম, কলিকাতা তেমনই একখানি গণ্ডগ্রাম মাত্র, একজন ভদ্রলোকের নাম করিলেই লোকে বলিয়া দিবে। এখন দেখিলাম যে, কলিকাতা অনন্ত অট্টালিকার সমুদ্রবিশেষ। আমার জ্ঞাতি-খুড়াকে সন্ধান করিবার কোন উপায় দেখিলাম না। কৃষ্ণদাসবাবু আমার হইয়া সন্ধান করিলেন, কিন্তু কলিকাতায় একজন সামান্য গ্রাম্যলোকের ওরূপ সন্ধান করিলে কি হইবে?

কৃষ্ণদাসবাবু কালীর পূজা দিয়া কাশী যাইবেন, কল্পনা ছিল। পূজা দেওয়া হইল, এক্ষণে সপরিবারে কাশী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তাঁহার পত্নী কহিলেন, "তুমি আমার কথা শুন। এখন কাহারও বাড়ীতে দাসীপনা কর। আজ সুবি আসিবার কথা আছে, তাকে বলিয়া দিব, তাদের বাড়ীতে তোমায় চাকরাণী রাখিবে।"

আমি শুনিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। শেষে কি কপালে দাসীপনা ছিল? আমার ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। কৃষ্ণদাসবাবুর দয়া হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি বলিলেন, "আমি কি করিব?" সে-কথা সত্য। তিনি কি করিবেন? আমার কপাল!

আমি একটা ঘরের ভিতর গিয়া কোণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে কৃষ্ণদাসবাবুর গৃহিণী আমাকে ডাকিলেন। আমি বাহির হইয়া তাঁহার কাছে গেলাম। তিনি বলিলেন, "এই সুবো এয়েছে। তুমি যদি ওদের বাড়ী ঝি থাক, বলিয়া দিই।"

ঝি থাকিব না, না খাইয়া মরিব, সে-কথা ত স্থির করিয়াছি, কিন্তু এখনকার সে-কথা নহে—এখন একবার সুবোকে দেখিয়া লইলাম। "সুবো" শুনিয়া আমি ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম যে 'সাহেব সুবো' দরের একটা কি জিনিস—আমি তখন পাড়াগেঁয়ে মেয়ে। দেখিলাম, তা নয়—একটি স্ত্রীলোক—দেখিবার মত সামগ্রী। মানুষটি আমারই বয়সী হইবে, রঙ আমা অপেক্ষা যে ফরসা, তাও নয়। বেশ-ভূষা এমন কিছু নয়। তাতেই দেখিবার সামগ্রী। এমন মুখ দেখি নাই। যেন পদ্মটি ফুটিয়া আছে—সুবোর সঙ্গে একটি তিন বছরের ছেলে—সেটিও তেমনি একটি আধফুটন্ত ফুল। উঠিতেছে, বসিতেছে, খেলিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, নাচিতেছে, দৌড়াইতেছে, হাসিতেছে, বকিতেছে, মারিতেছে, সকলকে আদর করিতেছে।

আমি অনিমেষলোচনে সুবোকে ও তার ছেলেকে দেখিতেছি দেখিয়া কৃষ্ণদাসবাবুর গৃহিণী চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কথার উত্তর দাও না যে—ভাব কি ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "উনি কে ?"

গৃহিণীঠাকুরাণী ধমকাইয়া বলিলেন, "তাও কি বলিয়া দিতে হইবে। ও সুবো, আর কে ?" তখন সুবো একটু হাসিয়া বলিল, "তা মাসীমা, একটু বলিয়া দিতে হয় বৈকি ? উনি নূতন লোক, আমায় ত চেনেন না।"

এই বলিয়া সুবো আমার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আমার নাম সুভাষিণী গো—ইনি আমার মাসীমা, আমাকে ছেলেবেলা থেকে ওঁরা সুবো বলেন।"

তারপর কথার সূত্রটা গৃহিণী নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন, বলিলেন, "কলিকাতার রামরাম দত্তের ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। তারা বড় বড়মানুষ। ছেলেবেলা থেকে ও শ্বশুরবাড়ীই থাকে—আমরা

কখন দেখিতে পাই না। আমি কালীঘাটে এসেছি শুনে আমাকে একবার দেখা দিতে এসেছে। ওরা বড়মানুষ। বড়মানুষের বাড়ী তুমি কাজকর্ম্ম করিতে পারিবে ত ?"

আমার চোখে জলও আসিল। মুখে হাসিও আসিল। তাহা আর কেহ দেখিল না, সুভাষিণী দেখিল। গৃহিণীকে বলিল, "আমি একটু আড়ালে সে-সকল কথা ওঁকে বলিগে। যদি উনি রাজি হন, তবে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" এই বলিয়া সুভাষিণী আমার হাত ধরিয়া টানিয়া একটা ঘরের ভিতর লইয়া গেল। সেখানে কেহ ছিল না। কেবল ছেলেটি মার সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়াইয়া গেল। একখানা তক্তপোষ পাতা ছিল, সুভাষিণী তাহাতে বসিল, আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল। বলিল, "আমার নাম, না জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছি। তোমার নাম কি ভাই ?"

যদি দাসীপনা করিতে পারি, তবে ইহার কাছে পারি, মনে-মনে ইহা ভাবিয়াই উত্তর করিলাম, "আমার দুইটি নাম—একটি চলিত, একটি অপ্রচলিত। যেটি অপ্রচলিত, তাহাই ইহাদিগকে বলিয়াছি ; কাজেই আপনার কাছে এখন তাহাই বলিব। আমার নাম কুমুদিনী।"

ছেলে বলিল, "কুনুডিনী ?"

সুভাষিণী বলিল, "আর নাম এখন নাই শুনিলাম, জাতি কায়স্থ বটে ?"

হাসিয়া বলিলাম, "আমরা কায়স্থ।"

সুভাষিণী বলিল, "কার মেয়ে, কার বউ, কোথায় বাড়ী, তাহা এখন জিজ্ঞাসা করিব না। এখন যাহা বলিব, তাহা শুন। তুমি বড়মানুষের মেয়ে তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমার হাতে, গলায় গহনার কালি আজও রহিয়াছে। তোমাকে দাসীপনা করিতে বলিব না—তুমি কিছু-কিছু রাঁধিতে জান না কি ?"

আমি বলিলাম, "জানি। রান্নায় আমি পিত্রালয়ে যশস্বিনী ছিলাম।"

সুভাষিণী বলিল, "আমাদের বাড়ীতে আমরা সকলেই রাঁধি। তবু কলিকাতার একটা রেওয়াজমত পাচিকাও আছে। সে বাড়ী যাইবে, এখন মাকে বলিয়া তোমাকে তার জায়গায় রাখিয়া দিব। তোমাকে রাঁধুনীর মত রাঁধিতে হইবে না। আমরা সকলেই রাঁধিব, তার সঙ্গে তুমি দুই-একদিন রাঁধিবে। কেমন, রাজি ?"

বলিলাম, "আপনার কাছে দাসীপনা করিতেও রাজি।"

"আপনি কেন বল ভাই ? বল ত মাকে বলিও। সেই মাকে লইয়া একটু গোল আছে। তিনিও একটু খিট্‌খিটে—তাঁকে বশ করিয়া লইতে হইবে। তা তুমি পারিবে—আমি মানুষ চিনি। কেমন, রাজি ?"

আমি বলিলাম, "রাজি না হইয়া কি করি ? আমার আর উপায় নাই।" আমার চক্ষুতে আবার জল আসিল।

সে বলিল, "উপায় নাই কেন ? রও ভাই, আমি আসল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। আমি আসিতেছি।"

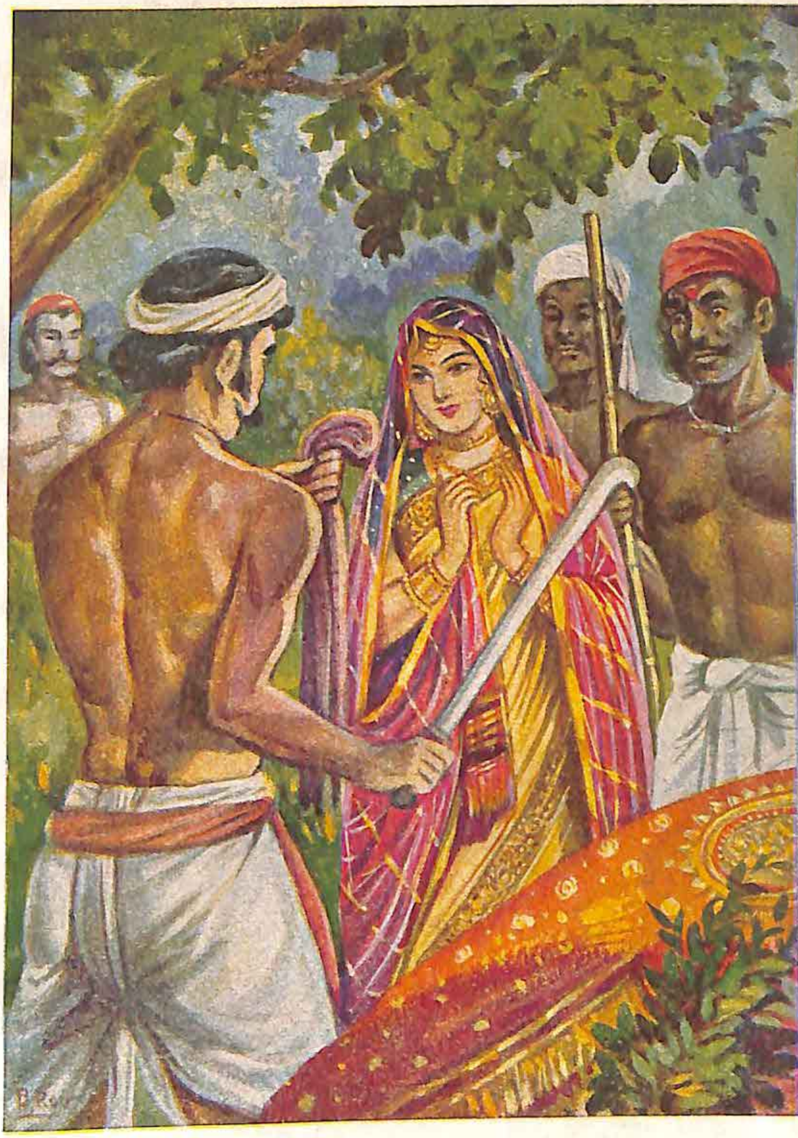
সুভাষিণী ভোঁ করিয়া ছুটিয়া মাসীর কাছে গেল—বলিল, "হাঁ গা, ইনি তোমাদের কে গা ?"

ঐটুকু পর্য্যন্ত আমি শুনিতে পাইলাম। তার মাসী কি বলিলেন, তা শুনিতে পাইলাম না। বোধ হয়, তিনি যতটুকু জানিতেন, তাহাই বলিলেন।

আমি সুভাষিণীর ছেলের সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম। এমন সময় সুভাষিণী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "চল, গাড়ী তৈয়ারী।"

সুভাষিণী আমাকে টানিয়া লইয়া গাড়ীতে তুলিল।

———



একখানি মলিন জীর্ণ বস্ত্র দিতে দিতে বলিল, "তোমার যাহা কিছু আছে দাও, নহিলে প্রাণে মারিব।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কালির বোতল

মা—সুভাষিণীর শাশুড়ী। তাঁহাকে বশ করিতে হইবে—সুতরাং গিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইলাম, তারপর এক নজর দেখিয়া লইলাম, মানুষটা কি রকম। তিনি তখন ছাদের উপর অন্ধকারে একটা পাটি পাতিয়া, তাকিয়া মাথায় দিয়া শুইয়া আছেন, একটা ঝি পা টিপিয়া দিতেছে। আমার বোধ হইল, একটা লম্বা কালির বোতল গলায়-গলায় কালি-ভরা, পাটির উপর কাত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। পাকা চুলগুলি বোতলটির টিনের ঢাকনির মত শোভা পাইতেছে, অন্ধকারটা বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া গৃহিণীঠাকুরাণী বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে ?"

বধূ বলিল, "তুমি একটি রাঁধুনী খুঁজিতেছিলে, তাই একে নিয়ে এসেছি।"

গৃহিণী। কোথায় পেলে ?

বধূ। মাসীমা দিয়াছেন।

গৃ। বামন ? না কায়েত ?

ব। কায়েত।

গৃ। আঃ! তোমার মাসীমার পোড়াকপাল। কায়েতের মেয়ে নিয়ে কি হবে ? একদিন বামনকে ভাত দিতে হলে কি দিব ?

ব। রোজ ত আর বামনকে ভাত দিতে হবে না—যে কয় দিন চলে চলুক, তারপর বামনী পেলে রাখা যাবে—তা বামনের মেয়ের ঠ্যাকার বড়—আমরা তাঁদের রান্নাঘরে গেলে হাঁড়িকুঁড়ি ফেলিয়া দেন, আবার পাতের প্রসাদ দিতে আসেন! কেন, আমরা কি মুচি ?

আমি মনে-মনে সুভাষিণীকে ভূয়সী প্রশংসা করিলাম—কালিভরা লম্বা বোতলটাকে সে মুঠোর ভিতর আনিতে জানে দেখিলাম।

গৃহিণী বলিলেন, "তা সত্যি বটে মা—ছোটলোকের এত অহঙ্কার সওয়া যায় না। তা, এখন দিনকতক কায়েতের মেয়েই রেখে দেখি। মাইনে কত বলেছে ?"

ব। তা আমার সঙ্গে কোন কথা হয় নাই।

গৃ। হায় রে কলিকালের মেয়ে! লোক রাখতে নিয়ে এসেছ, তাই মাইনের কথা কও নাই ?

আমাকে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নেবে তুমি ?"

আমি বলিলাম, "যখন আপনাদের আশ্রয় নিতে এয়েছি, তখন যা দিবেন, তাই নিব।"

গৃ। তা, বামনের মেয়েকে কিছু বেশী দিতে হয় বটে, কিন্তু তুমি কায়েতের মেয়ে—তোমায় তিন টাকা মাসে, আর খোরাক-পোষাক দিব।

আমার একটু আশ্রয় পাইলেই যথেষ্ট—সুতরাং তাহাতে সম্মত হইলাম। বলা বাহুল্য যে, মাহিয়ানা লইতে হইবে শুনিয়াই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, বলিলাম, "তাই দিবেন।"

মনে করিলাম গোল মিটিল, কিন্তু তাহা নহে। লম্বা বোতলটায় কালি অনেক। তিনি বলিলেন, "তোমার বয়স কি গা ?"

আমি বলিলাম, "বয়স এই উনিশ কুড়ি।"

গৃহিণী। তবে বাছা, অন্যত্র কাজের চেষ্টা দেখ গিয়া যাও। আমি সমত্ত লোক রাখি না।

সুভাষিণী মাঝে হইতে বলিল, "কেন মা সমত্ত লোক কি মন্দ ?"

গৃহিণী। ছোটলোক যারা খেটে খায়, তারা কি ভাল ?

এবার কান্না রাখিতে পারিলাম না; কাঁদিয়া উঠিয়া গেলাম। কালির বোতলটা পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছুঁড়ী চললো না কি ?"

সুভাষিণী বলিল, "বোধ হয়।"

গৃ। তা যাক গে।

সু। কিন্তু গৃহস্থবাড়ী থেকে না খেয়ে যাবে ? উহাকে কিছু খাওয়াইয়া বিদায় করিতেছি।

এই বলিয়া সুভাষিণী আমার পিছু-পিছু উঠিয়া আসিল। আমাকে ধরিয়া আপনার শয়নগৃহে লইয়া গেল। আমি বলিলাম, "আর আমায় ধরিয়া রাখিতেছ কেন? পেটের দায়ে, কি প্রাণের দায়ে, আমি এমন সব কথা শুনিবার জন্য থাকিতে পারিব না।"

সুভাষিণী বলিল, "থাকিয়া কাজ নাই। কিন্তু আমার অনুরোধে আজিকার রাত্রিটা থাক।"

কোথায় যাইব? কাজেই চক্ষু মুছিয়া সে রাত্রিটা থাকিতে সম্মত হইলাম। এ-কথা ও-কথার পর সুভাষিণী জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে যদি না থাক, তবে যাবে কোথায়?"

আমি বলিলাম, "গঙ্গায়।"

এবার সুভাষিণীও একটু চক্ষু মুছিল। বলিল, "গঙ্গায় যাইতে হইবে না। আমি কি করি, তা একটুখানি বসিয়া দেখ। গোলযোগ উপস্থিত করিও না—আমার কথা শুনিও।"

এই বলিয়া সুভাষিণী হারাণী বলিয়া ঝিকে ডাকিল। হারাণী সুভাষিণীর খাস ঝি। হারাণী আসিল। মোটা-সোটা কালো কুচকুচে, চল্লিশ পার, হাসি মুখে ধরে না, সকল তাতেই হাসি। একটু তির্‌বিরে! সুভাষিণী বলিল, "একবার তাঁকে ডেকে পাঠাও।"

হারাণী হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম, "আমায় উঠিয়া যাইতে হইবে কি?"

সুভাষিণী বলিল, "না। এইখানে বসিয়া থাক।"

সুভাষিণীর স্বামী আসিলেন এবং আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "ইনি কে?"

সুভাষিণী বলিল, "ওঁর জন্যই তোমাকে ডেকেছি। আমাদের রাঁধুনী বাড়ী যাবে, তাই ওঁকে তার জায়গায় রাখিবার জন্য আমি মাসীর কাছ হইতে এনেছি। কিন্তু মা ওঁকে রাখিতে চান না।"

সুভার স্বামী একটু হাসিলেন। বলিলেন, "তা আমায় কি করিতে হইবে?"

সু। ওঁকে রাখিয়ে দিতে হবে।

তাঁর স্বামী বলিলেন, "যে আজ্ঞা।"

সুভা। কখন্ পারিবে?

স্বামী। খাওয়ার সময়।

তিনি গেলে আমি বলিলাম, "উনি যেন রাখাইলেন, কিন্তু এমন কটু কথা সয়ে আমি থাকি কি প্রকারে?"

সুভাষিণী। সে পরের কথা পরে হবে। গঙ্গা ত আর একদিনে বুজিয়া যাইবে না।

রাত্রি নয়টার সময় সুভাষিণীর স্বামী রমণবাবু আহার করিতে আসিলেন। তাঁর মা কাছে গিয়া বসিল। সুভাষিণী আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল, বলিল, "কি হয় দেখি গে চল।"

আমরা আড়াল হইতে দেখিলাম, নানাবিধ ব্যঞ্জন রান্না হইয়াছে, কিন্তু রমণবাবু একবার একটু করিয়া মুখে দিলেন, আর সরাইয়া রাখিলেন। কিছুই খাইলেন না। তাঁর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছুই ত খেলি না বাবা!"

পুত্র বলিল, "ও রান্না ভূত-প্রেতে খেতে পারে না; ওর রান্না খেয়ে খেয়ে অরুচি জন্মে গেছে। মনে করেছি কাল থেকে পিসিমার বাড়ী গিয়ে খেয়ে আসব।"

তখন গৃহিণী ছোট হয়ে গেলেন। বলিলেন, "তা করতে হবে না যাদু! আমি অন্য রাঁধুনী আনাইতেছি।"

বাবু হাত ধুইয়া উঠিয়া গেলেন। দেখিয়া সুভাষিণী বলিল, "আমাদের জন্য ভাই ওঁর খাওয়া হইল না। তা না হোক্—কাজটা হইলে হয়।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া কি বলিতেছিলাম, এমন সময়ে হারাণী আসিয়া সুভাষিণীকে বলিল, "তোমার শাশুড়ী ডাকিতেছেন।"

সুভাষিণী শাশুড়ীর কাছে গেল, আমি আড়াল হইতে শুনিতে লাগিলাম।

সুভাষিণীর শাশুড়ী বলিল, "সে কায়েত ছুঁড়ীটা আজ না হয় নাই গেল। কাল তাকে দিয়া তুই একখানা রাঁধিয়ে দেখিতে হইবে।"

সুভা। তবে তাকে রাখি গে।

এই বলিয়া সুভাষিণী আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই তুমি ভাল রাঁধিতে পার ত ?"

আমি। কাল খেয়ে দেখে বুঝিতে পারিবে।

সুভা। যদি অভ্যাস না থাকে তবে বল, আমি কাছে বসিয়া শিখিয়ে দিব।

আমি হাসিলাম। বলিলাম, "পরের কথা পরে হবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিবি পাণ্ডব

পরদিন রাঁধিলাম। সুভাষিণী দেখাইয়া দিতে আসিয়াছিল, আমি ইচ্ছা করিয়া সেইসময়ে লঙ্কা ফোড়ন দিলাম—সে কাসিতে কাসিতে উঠিয়া গেল, বলিল, "মরণ আর কি!"

রান্না হইলে, বালক-বালিকারা প্রথমে খাইল। সুভাষিণীর ছেলে অন্ন-ব্যঞ্জন বড় খায় না, কিন্তু সুভাষিণীর পাঁচ বৎসরের একটি মেয়ে ছিল। সুভাষিণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন রান্না হয়েছে, হেমা?"

সে বলিল, "বেশ! বেশ গো বেশ।"

তারপর রমণবাবু খাইতে বসিলেন। আড়াল হইতে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তিনি সমস্ত ব্যঞ্জনগুলি কুড়াইয়া খাইলেন। গৃহিণীর মুখে হাসি ধরে না। রমণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কে রেঁধেছে মা?"

গৃহিণী বলিলেন, "একটি নূতন লোক আসিয়াছে।"

রমণবাবু বলিলেন, "রাঁধে ভাল।" এই বলিয়া তিনি হাত ধুইয়া উঠিয়া গেলেন।

বাড়ীর বুড়ো-কর্ত্তাও রান্নার খুব প্রশংসা করিলেন। তাহাতে পুরাতন পাচিকার সমস্ত রাগ আমার উপর আসিয়া পড়িল এবং অকথ্য ভাষায় আমাকে গালাগালি দিল, কিন্তু হাসিয়া সমস্তই সহ্য করিতে হইল।

ইহাতে আমার কাজ হাসিল হইল। বুড়ী আমার উপর খুশী হইল।

তারপর গৃহিণী আহারে বসিলেন। বসিয়া থাকিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে ব্যঞ্জনগুলি খাওয়াইলাম। তিনি বলিলেন, "রাঁধ ভাল ত গা! কোথায় রান্না শিখিলে?"

আমি বলিলাম, "বাপের বাড়ী !"

গৃহিণী। তোমার বাপের বাড়ী কোথায় গা ?

আমি একটা মিছে কথা বলিলাম। গৃহিণী বলিলেন, "এ ত বড়-মানুষের ঘরের মত রান্না। তোমার বাপ কি বড়মানুষ ছিলেন ?"

আমি। তা ছিলেন।

গৃহি। তবে তুমি রাঁধিতে আসিয়াছ কেন ?

আমি। দুরবস্থায় পড়িয়াছি।

গৃহি। তা, আমার কাছে থাক, বেশ থাকিবে। তুমি বড়মানুষের মেয়ে, আমার ঘরে তেমনই থাকিবে।

পরে সুভাষিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌমা, দেখো গো, এঁকে যেন কেউ কড়া কথা না বলে—আর তুমি ত বল্‌বেই না, তুমি ত তেমন মানুষের মেয়ে নও।"

সুভাষিণীর ছেলে সেখানে বসিয়াছিল। ছেলে বলিল, "আমি কলা কতা বলব।"

আমি বলিলাম, "বল দেখি।"

সে বলিল, "কলা, চাতু (চাটু), হাঁলি,—আর কি মা ?"

সুভাষিণী বলিল, "আর তোর শাশুড়ী !"

ছেলে বলিল, "কৈ ছাছুলী ?" সুভাষিণীর মেয়ে আমাকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ তোর শাশুড়ী।" তখন ছেলে বলিল, "কুন্নুডিনী ছাছুলী।"

সুভাষিণী আমার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাইবার জন্য বেড়াইতেছিল। ছেলে-মেয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া সে বলিল, "তবে আজ হইতে তুমি আমার বেহাইন হইলে।"

তারপর সুভাষিণী খাইতে বসিল। আমি তাহারও কাছে খাওয়াইতে বসিলাম। খাইতে খাইতে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কয়টি বিয়ে, বেহান ?"

কথাটা বুঝিলাম, বলিলাম, "কেন, রান্নাটা দ্রৌপদীর মত লাগিল না কি ?"

সুভা। ও ইয়াস্! বিবি পাণ্ডব ফষ্ট ক্লাশ বাবর্চি ছিল। এখন আমার শাশুড়ীকে বুঝিতে পারিলে ত?

আমি বলিলাম, "বড় নয়। কাঙ্গালের আর বড়মানুষের মেয়ের সঙ্গে সকলেই একটু প্রভেদ করে।"

সুভাষিণী হাসিয়া বলিল, "এই বুঝি বুঝিয়াছ? তুমি বড় মানুষের মেয়ে বলে বুঝি তোমার আদর করেছেন?"

আমি বলিলাম, "তবে কি?"

সুভা। ওঁর ছেলে পেট ভ'রে খাবে, তাই তোমার এত আদর। এখন যদি তুমি একটু কোট কর, তবে তোমার মাহিনা ডবল হইয়া যায়।

আমি বলিলাম, "আমি মাহিনা চাই না; আমি আশ্রয় পাইয়াছি, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

———

নবম পরিচ্ছেদ

পাকাচুলের সুখ-দুঃখ

আমি আশ্রয় পাইলাম। আর-একটি অমূল্য রত্ন পাইলাম—একটি হিতৈষিণী সখী। দেখিতে লাগিলাম যে, সুভাষিণী আমাকে আন্তরিক ভালবাসিতে লাগিল—আপনার ভগিনীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিতে হয়, আমার সঙ্গে তেমনই ব্যবহার করিত। তার শাসনে দাসদাসীরাও আমাকে অমান্য করিত না। এদিকে রান্নাবান্না সম্বন্ধেও সুখ হইল। সে বুড়ী ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী—তাঁহার নাম সোনার মা,—তিনি বাড়ী গেলেন না। মনে করিলেন, তিনি গেলে আর চাকরিটি পাইবেন না, আমি কায়েমী হইব। তিনি এই ভাবিয়া নানা ছুতা করিয়া বাড়ী গেলেন না। সুভাষিণীর সুপারিসে আমরা দুইজনেই রহিলাম। তিনি শাশুড়ীকে বুঝাইলেন যে, কুমুদিনী ভদ্রলোকের মেয়ে, একা সব রান্না পারিয়া উঠিবে না—আর সোনার মা বুড়া মানুষই-বা কোথা যায়? শাশুড়ী বলিল, "দুইজনকেই কি রাখিতে পারি? এত টাকা যোগায় কে?"

বধূ বলিল, "তা একজনকে রাখিতে হলে সোনার মাকে রাখিতে হয়। কুমু এত পারবে না।"

গৃহিণী বলিলেন, "না না। সোনার মার রান্না আমার ছেলে খেতে পারে না। তবে দুইজনই থাক।"

আমার কষ্ট নিবারণ জন্য সুভাষিণী এই কৌশলটুকু করিল। গিন্নী তার হাতে কলের পুতুল; কেননা, সে রমণের বৌ, রমণের বৌএর কথা ঠেলে কার সাধ্য? তাতে আবার সুভাষিণীর বুদ্ধি যেমন প্রখরা, স্বভাবও তেমনি সুন্দর। এমন বুদ্ধি পাইয়া আমার এ দুঃখের দিনে একটু সুখ হইল।

আমি মাছ-মাংস রাঁধি, বা দুই-একখানা ভাল ব্যঞ্জন রাঁধি—বাকি সময়টুকু সুভাষিণীর সঙ্গে গল্প করি—তার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে খেলা

করি। গৃহিণীর বিশ্বাস, তাঁহার বয়স এমন-কিছু বেশী নয় এবং সেইজন্য তাঁহার মাথার চুল বিশেষ-কিছু পাকে নাই। তিনি একদিন এই কাজে আমাকে বেগার ধরিলেন। কিন্তু চুল তুলিতে গিয়া দেখিলাম, মাথা প্রায় শাদা হইয়া আসিয়াছে। একদিন বুড়ীর পাকা চুল তুলিতেছি, এমন সময় দেখি, সুভাষিণী অঙ্গুলী সঙ্কেতে আমাকে ডাকিতেছে। গৃহিণীর কাজ হইতে ছুটি লইয়া তাহার কাছে গেলাম।

সুভাষিণী বলিল, "ও কি কাণ্ড! আমার শাশুড়ীকে নেড়ামুড়া করিয়া দিতেছ কেন?"

আমি বলিলাম, "ও পাপ একদিনে চুকানই ভাল।"

সুভা। তাহলে কি টেকতে পারবে? যাবে কোথায়?

আমি। আমার হাত থামে না যে।

সুভা। মরণ আর কি! দুই-একগাছি তুলে চলে আসতে পার না?

আমি। তোমার শাশুড়ী যে ছাড়ে না।

সুভা। বল গে যে, কৈ, পাকা চুল ত বেশী দেখিতে পাই না—এই বলে চলে এসো।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এমন দিনে-ডাকাতি কি করা যায়? লোকে বলবে কি? এ যে আমার কালাদীঘির ডাকাতি।"

সুভা। কালাদীঘির ডাকাতি কি?

সুভাষিণীর সঙ্গে কথা কহিতে-কহিতে আমি একটু আত্মবিস্মৃত হইলাম—হঠাৎ কালাদীঘির কথা অসাবধানে মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল। কথাটা চাপিয়া গেলাম। বলিলাম, "সে গল্প আর-এক দিন করিব!"

সুভা। আমি যা বলিলাম, তা একবার বলিয়াই দেখ-না? আমার অনুরোধে।

হাসিতে-হাসিতে আমি গিন্নীর কাছে গিয়া আবার পাকাচুল তুলিতে বসিলাম। দুই-চারিগাছা তুলিয়া বলিলাম, "কৈ, আর বড় পাকা দেখিতে পাই না। দুই-একগাছা রহিল, কাল তুলে দিব!"

গৃহিণী একগাল হাসিলেন। বলিলেন, "আবার বেটীরা বলে, সব চুলই পাকা।"

সেদিন আমার আদর বাড়িল। কিন্তু যাহাতে দিন-দিন বসিয়া-বসিয়া পাকা চুল তুলিতে না হয়, সে ব্যবস্থা করিব মনে-মনে স্থির করিলাম, বেতনের টাকা পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে একটা টাকা হারাণীর হাতে দিলাম। বলিলাম, "একটা টাকায় এক শিশি কলপ কারও হাত দিয়া কিনিয়া আনিয়া দে।"

হারাণী হাসে, কিন্তু কাজের লোক। শীঘ্র এক শিশি উত্তম কলপ আনিয়া দিল। আমি তাহা হাতে করিয়া গিন্নীর পাকা চুল তুলিতে গেলাম। গিন্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতে কি ও?"

আমি বলিলাম, "একটা আরক। এটা চুলে মাখাইলে সব পাকা চুল উঠিয়া আসে, কাঁচা চুল থাকে!"

গৃহিণী বলিলেন, "বটে! এমন আশ্চর্য্য আরক ত কখন শুনি নাই। ভাল, মাখাও দেখি। দেখিও, কলপ দিও না যেন।"

আমি উত্তম করিয়া তাঁহার চুলে কলপ মাখাইয়া দিলাম। কিন্তু তাহা লইয়া এক গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। সোনার মা গিন্নীর মাথায় কালো চুল দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "ওমা, আপনার মাথায় কে কলপ মাখাইয়া দিল?"

গিন্নী তাহাতে মনে-মনে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা কুমো! তুমি কি আমার মাথায় কলপ দিয়াছ?"

দেখিলাম, গৃহিণীর মুখখানা বেশ প্রসন্ন। আমি বলিলাম, "অমন কথা কে বল্লে মা?"

গৃ। এই যে সোনার মা বল্‌ছে!

আমি। সোনার মার কি? ও কলপ নয় মা, আমার ওষুধ।

গৃ। তা বেশ ওষুধ বাছা! আরসি একখানা আন দেখি।

একখানি আরসি আনিয়া দিলাম। দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ওমা! সব চুল কালো হয়ে গেছে। আঃ, আবেগের বেটি! লোকে এখনই বল্‌বে, কলপ দিয়াছে!"

গৃহিণীর মুখে হাসি ধরে না। সেদিন সন্ধ্যার পর আমার রান্নার সুখ্যাতি করিয়া আমার বেতন বাড়াইয়া দিলেন, আর বলিলেন, "বাছা! কেবল কাচের চুড়ি হাতে দিয়া বেড়াও, দেখিয়া কষ্ট হয়।" এই বলিয়া তিনি নিজের বহুকালপরিত্যক্ত এক জোড়া সোনার বালা আমায় বকশিস করিলেন। লইতে আমার মাথা কাটা গেল—চোখের জল সামলাইতে পারিলাম না। কাজেই "লইব না" কথাটা বলিবার অবসর পাইলাম না।

একটু অবসর পাইয়া বুড়ো বামুন-ঠাকুরাণী আমাকে ধরিল। বলিল, "ভাই, আর সে ওষুধ নেই কি?"

"আছে।" বলিয়া আমি তখন কলপের শিশি বামুন-ঠাকুরাণীকে দিয়া দিলাম। ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী রাত্রিতে জলযোগান্তে শয়নকালে অন্ধকারে চুলে মাখাইবার সময় কতক চুলে ও কতক মুখে-চোখে লাগাইয়া ফেলিয়াছিল। সকালে তাহাকে দেখিয়া পৌরবর্গ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। হারাণী হাসিতে-হাসিতে বেদম হইয়া বলিল, "বৌঠাকুরাণী, আমাকে জবাব দাও। আমি এমন হাসির বাড়ীতে থাকিলে কোন দিন দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইব।"

———

দশম পরিচ্ছেদ

আশার প্রদীপ

সেইদিন বৈকালে সুভাষিণী আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া নিভৃতে বসাইল। বলিল, "বেহান, তুমি কালাদীঘির গল্পটি বলিবে বলিয়াছিলে—আজিও বল নাই। আজ বল না, শুনি।"

আমি অনেকক্ষণ ভাবিলাম। শেষে বলিলাম, "সে আমারই হতভাগ্যের কথা। আমার বাপ বড়মানুষ, এ-কথা বলিয়াছি। তোমার শ্বশুরও বড়মানুষ—কিন্তু তুলনায় কিছুই নহেন। আমায় বাপ আজিও আছেন—তাঁহার সেই অতুল ঐশ্বর্য্য এখনও আছে, আজিও তাঁহার হাতীশালে হাতী বাঁধা। আমি যে রাঁধিয়া খাইতেছি, কালাদীঘির ডাকাইতি তাহার কারণ।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। সুভাষিণী বলিল, "তোমার যদি বলিতে কষ্ট হয়, তবে নাই বলিলে। আমি না জানিয়া শুনিতে চাহিয়াছিলাম।"

আমি বলিলাম, "সমস্তই বলিব, তুমি আমাকে যে স্নেহ কর, আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহাতে বলিতে কোন কষ্ট নাই।"

আমি বাপের নাম বলিলাম না, বাপের বাড়ীর নাম বলিলাম না। স্বামীর বা শ্বশুরের নাম বলিলাম না, শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের নাম বলিলাম না, আর সমস্ত বলিলাম। শুনিতে-শুনিতে সুভাষিণী কাঁদিতে লাগিল। আমিও যে বলিতে-বলিতে মধ্যে-মধ্যে কাঁদিয়া ফেলিলাম, তা বলা বাহুল্য।

সেদিন এই পর্য্যন্ত। পরদিন সুভাষিণী আমাকে আবার নিভৃতে লইয়া গেল। বলিল, "বাপের নাম বলিতে হইবে।"

তাহা বলিলাম।

"তাঁর বাড়ী যে গ্রামে, তাহাও বলিতে হইবে।"

তাও বলিলাম।

সু। ডাকঘরের নাম বল।

আমি। ডাকঘর! ডাকঘরের নাম ডাকঘর।

সু। দূর পোড়ারমুখী! যে গ্রামে ডাকঘর, তার নাম।

আমি। তা ত জানি না! ডাকঘরই জানি।

সু। বলি, যে গ্রামে তোমাদের বাড়ী, সেই গ্রামেই ডাকঘর আছে, না, অন্য গ্রামে?

আমি। তা ত জানি না।

সুভাষিণী বিষণ্ণ হইল। আর কিছু বলিল না। পরদিন সেইরূপ নিভৃতে বলিল, "তুমি বড়ঘরের মেয়ে, কত কাল রাঁধিয়া খাইবে? তুমি গেলে আমি বড় কাঁদিব— কিন্তু আমার সুখের জন্য তোমার ক্ষতি করি, এমন পাপিষ্ঠা আমি নই। আমরা পরামর্শ করিয়াছি—"

কথা শেষ না হইতে-হইতেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা কে কে?"

সু। আমি আর র-বাবু।

র-বাবু কি না রমণবাবু। এইরূপে সুভাষিণী আমার কাছে স্বামীর নাম ধরিত। তখন সে বলিতে লাগিল, "পরামর্শ করিয়াছি যে, তোমার বাপকে পত্র লিখিব যে, তুমি এইখানে আছ, তাই ডাকঘরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

আমি। তবে সকল কথা তাঁহাকে বলিয়াছ?

সু। বলিয়াছি—দোষ কি?

আমি। দোষ কিছু না। তার পর?

সু। এখন মহেশপুরেই ডাকঘর আছে, বিবেচনা করিয়া পত্র লেখা হইল।

আমি। পত্র লেখা হইয়াছে না কি?

সু। হ্যাঁ।

আমি আহ্লাদে আটখানা হইলাম। দিন গণিতে লাগিলাম, কতদিনে পত্রের উত্তর আসিবে! কিন্তু উত্তর আসিল না। আমার কপাল পোড়া—মহেশপুরে কোন ডাকঘর ছিল না। তখন গ্রামে-

গ্রামে ডাকঘর হয় নাই। ভিন্ন গ্রামে ডাকঘর ছিল—আমি রাজার দুলালী—অত খবর রাখিতাম না। ডাকঘরের ঠিকানা না পাইয়া, কলিকাতার বড় ডাকঘরে রমণবাবুর চিঠি খুলিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিল।

আমি আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু র-বাবু—নাছোড়। সুভাষিণী আসিয়া আমাকে বলিল, "এখন স্বামীর নাম বলিতে হইবে।"

আমি তখন লিখিতে শিখিয়াছিলাম। স্বামীর নাম লিখিয়া দিলাম। পরে জিজ্ঞাসা হইল, "শ্বশুরের নাম?"

তাও লিখিলাম।

"গ্রামের নাম?"

তাও বলিয়া দিলাম।

"ডাকঘরের নাম?"

বলিলাম, "তা কি জানি?"

শুনিলাম, রমণবাবু সেখানেও পত্র লিখিলেন। কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। বড় বিষণ্ণ হইলাম। কিন্তু একটা কথা তখন মনে পড়িল, আমি আশায় বিহ্বল হইয়া পত্র লিখিতে বারণ করি নাই। এখন আমার মনে পড়িল, ডাকাতে আমাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে; আমার কি জাতি আছে? এই ভাবিয়া, শ্বশুর, স্বামী আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন সন্দেহ নাই। সে স্থলে পত্র লেখা ভাল হয় নাই।

ঐ-কথা শুনিয়া সুভাষিণী চুপ করিয়া রইল।

আমি এখন বুঝিলাম যে, আমার আর ভরসা নাই। আমি শয্যা লইলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

একটা চোরা চাহনি

এক দিবস প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম, কিছু ঘটার আয়োজন। রমণবাবু উকীল। তাঁহার একজন বড় মোয়াক্কেল ছিল। দুইদিন ধরিয়া শুনিতেছিলাম, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। রমণবাবু ও তাঁহার পিতা সর্ব্বদা তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছিলেন। তাঁহার কারণ এই যে, তাঁহার সহিত কারবার-ঘটিত কিছু সম্বন্ধ ছিল। আজ শুনিলাম, তাঁহাকে মধ্যাহ্নে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাই পাকশাকের বিশেষ আয়োজন হইতেছে।

রান্না ভাল চাই—অতএব পাকের ভারটা আমার উপর পড়িল। যত্ন করিয়া পাক করিলাম।

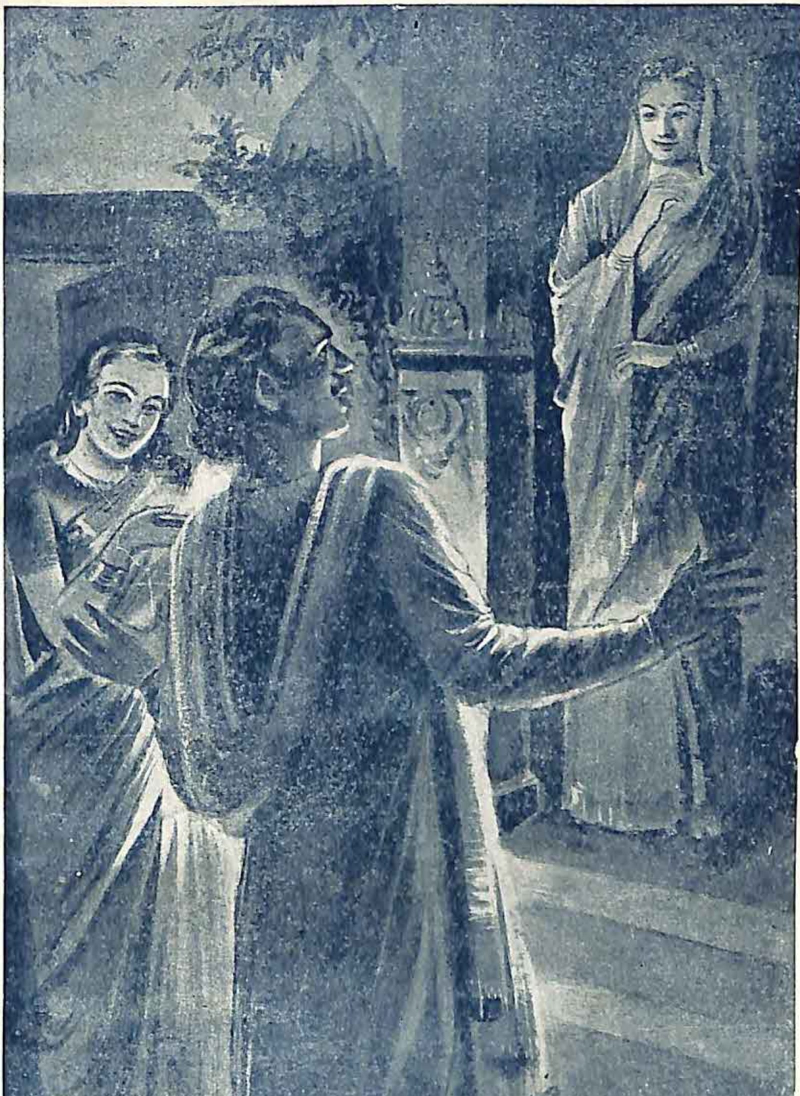
যথাসময়ে তিনি আসিলে, আহারের স্থান অন্তঃপুরেই হইল। রামরামবাবু, রমণবাবু ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আহারে বসিলেন। পরিবেশনের ভার বুড়ীর উপর—আমি বাহিরের লোককে কখন পরিবেশন করি না।

বুড়ী পরিবেশন করিতেছে—আমি রান্নাঘরে আছি—এমন সময়ে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। রমণবাবু বুড়ীকে বড় ধমকাইতে-ছিলেন। সেইসময়ে একজন রান্নাঘরের ঝি আসিয়া বলিল, "ইচ্ছে করে লোককে অপ্রতিভ করা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে?"

ঝি বলিল, "বুড়ী, দাদাবাবুর (বুড়ী ঝি, দাদাবাবু বলিত) বাটিতে ডাল দিতেছিল—তিনি তা দেখেও উহুঁ-উহুঁ করে হাত বাড়িয়ে দিলেন, সব ডাল হাতে পড়িয়া গেল।"

আমি এদিকে শুনিতেছিলাম, রমণবাবু বামনীকে ধমকাইতেছেন—"পরিবেশন করতে জাননা ত এসো কেন? আর কাকেও থাল দিতে পারনি?"



কামিনী আলো ধরিতেই তিনি ডাকিলেন, "কুমুদিনী! কুমুদিনী! যদি আসিয়াছ ত' আমায় আর ত্যাগ করিও না।"

রামরামবাবু বলিলেন, "তোমার কর্ম্ম নয়। কুমোকে পাঠাইয়া দাও গিয়া।"

গৃহিণী সেখানে নাই, বারণ করে কে? এদিকে খোদ কর্ত্তার হুকুম অমান্য বা করি কি প্রকারে? গেলেই গিন্নী রাগ করিবেন তাও জানি। দুই চারিবার বুড়ীকে বুঝাইলাম,—বলিলাম, "একটু সাবধান হয়ে দিও-থুইও।" কিন্তু সে ভয়ে যাইতে স্বীকৃত হইল না। কাজেই আমি হাত ধুইয়া, মুখ মুছিয়া পরিষ্কৃত হইয়া, কাপড়খানা গুছাইয়া পরিয়া, একটু ঘোমটা টানিয়া পরিবেশন করিতে গেলাম এবং বাধ্য হইয়াই আমাকে পরিবেশন করিতে হইল। ঘোমটার ভিতর হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিটিকে একবার দেখিয়া লইলাম।

দেখিয়াই, কেন জানি না, এক নিমেষের মতন আমার মনে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

পাকশালায় ফিরিয়া আসিয়া আমার যেন মনে হইল, আমি ইঁহাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি। সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আবার অন্তরাল হইতে ইঁহাকে দেখিতে গেলাম। বিশেষ করিয়া দেখিলাম। দেখিয়া মনে-মনে বলিলাম, "চিনিয়াছি।"

এমন সময়ে রামরামবাবু আবার অন্যান্য খাদ্য লইয়া যাইতে ডাকিয়া বলিলেন। অনেক প্রকার মাংস পাক করিয়াছিলাম—লইয়া গেলাম। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিটি রামরাম দত্তকে বলিলেন, "রামরামবাবু, আপনার পাচিকাকে বলুন যে পাক অতি পরিপাটী হইয়াছে।"

রামরাম ভিতরের কথা কিছুই বুঝিলেন না, বলিলেন, "হাঁ, উনি রাঁধেন ভাল।"

নিমন্ত্রিত বাবু কহিলেন, "কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য যে, আপনার বাড়ীতে দুই-একখানা ব্যঞ্জন আমাদের দেশের মত পাক হইয়াছে।"

আমি মনে-মনে ভাবিলাম, "চিনিয়াছি!" বস্তুতঃ দুই-একখানা আমাদের নিজ দেশের প্রথামত পাক করিয়াছিলাম।

রামরাম বলিলেন, "তা হবে, ওঁর বাড়ী এ দেশে নয়।"

ইনি এবার যো পাইলেন, একেবারে আমার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "তোমাদের বাড়ী কোথায় গা ?"

আমার প্রথম সমস্যা, কথা কই কি না কই। স্থির করিলাম, কথা কহিব।

দ্বিতীয় সমস্যা, সত্য বলিব, না, মিথ্যা বলিব ? স্থির করিলাম, মিথ্যা বলিব। কেন এরূপ স্থির করিলাম, তাহা যিনি স্ত্রীলোকের হৃদয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই জানেন। আমি ভাবিলাম, আবশ্যক হয়, সত্য কথা বলা আমার হাতেই রহিল। এখন আর-একটা বলিয়া দেখি। এই ভাবিয়া আমি উত্তর করিলাম, "আমাদের বাড়ী, কালাদীঘি।"

তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "কোন্ কালাদীঘি, ডাকাতে-কালাদীঘি ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ।"

তিনি আর কিছু বলিলেন না।

আমি মাংসপাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, দাঁড়াইয়া থাকা আমার যে অকর্ত্তব্য, আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। দেখিলাম যে, তিনি আর ভাল করিয়া আহার করিতেছেন না। তাহা দেখিয়া রামরাম দত্ত বলিলেন, "উপেন্দ্রবাবু আহার করুন না।"

ঐটি শুনিবার আমার বাকী ছিল। উপেন্দ্রবাবু! আমি নাম শুনিবার আগেই চিনিয়াছিলাম, ইনি আমার স্বামী।

আমি পাকশালায় গিয়া পাত্র ফেলিয়া একবার অনেক কালের পর আহ্লাদ করিতে বসিলাম। রামরাম দত্ত বলিলেন, "কি পড়িল ?"

আমি মাংসের পাত্রখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলাম।

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হারাণীর হাসি বন্ধ

মাংসপাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মনে-মনে স্থির করিলাম, যদি বিধাতা হারাধন মিলাইয়াছেন—তবে ছাড়া হবে না। বালিকার মত লজ্জা করিয়া সব নষ্ট না করি।

আমি তখন হারাণীর শরণাগত হইব মনে করিলাম। নিভৃতে ডাকিবামাত্র সে হাসিতে হাসিতে আসিল। সে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "পরিবেশনের সময় বামন ঠাকুরাণীর নাকালটা দেখিয়াছিলে?" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আবার হাসির ফোয়ারা খুলিল।

আমি বলিলাম, "তা জানি, কিন্তু আমি তার জন্য তোকে ডাকি নাই। আমার জন্মের শোধ একটা উপকার কর। ঐ বাবুটি কখন যাইবেন, আমাকে শীঘ্র খবর আনিয়া দে।"

হারাণী একেবারে হাসি বন্ধ করিল। এত হাসি, যেন ধুঁয়ার অন্ধকারে আগুন ঢাকা পড়িল। হারাণী গম্ভীর ভাবে বলিল, "কিছুতেই আমা হইতে এ কাজ হইবে না।" আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তাহা দেখিয়া হারাণীর দয়া হইল। সে বলিল, "কাঁদ কেন? চেনা মানুষ না কি?"

আমি একবার মনে করিলাম, হারাণীকে সব খুলিয়া বলি। তারপর ভাবিলাম, সে এত বিশ্বাস করিবে না, একটা বা গণ্ডগোল করিবে। ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিলাম, সুভাষিণী ভিন্ন আমার গতি নাই। সেই আমার বুদ্ধি, সেই আমার রক্ষাকারিণী—তাহাকে সব খুলিয়া বলিয়া পরামর্শ করি গিয়া। হারাণীকে বলিলাম, "চেনা মানুষ বটে—বড় চেনা, সকল কথা শুনিলে তুই বিশ্বাস করিবি না, তাই তোকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলাম না।"

হা। তোমাকে কি তার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে?

আমি। হাঁ।

হা। কখন্‌?

আমি। রাত্রে সবাই ঘুমাইলে।

হা। একা?

আমি। একা।

হারাণী সভয়ে বলিল, "আমার সাধ্য নাই।"

আমি। আর, বৌঠাকুরাণী যদি হুকুম দেন?

হা। তুমি পাগল হয়েছ?

আমি। যদি বারণ না করেন, যাবি?

হা। যাব।

আমি তখন চোখের জল মুছিয়া সুভাষিণীর সন্ধানে গেলাম। তাহাকে নিভৃতেই পাইলাম। আমাকে দেখিয়া সুভাষিণীর সেই সুন্দর মুখখানি যেন সকালের পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিল। হাসিয়া আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া সুভাষিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, চিনিয়াছ ত?"

আমি আকাশ থেকে পড়িলাম। বলিলাম, "সে কি? তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে?" সুভাষিণী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আহা, উনি বুঝি আপনি এসে ধরা দিয়েছেন? আমরা ফাঁদ পাততে জানি, তাই তোমার আকাশের চাঁদ ধ'রে এনে দিয়েছি।"

আমি বলিলাম, "তোমরা কে? তুমি আর র-বাবু?"

সুভ। না ত আবার কে? তুমি তোমার স্বামীর শ্বশুরের আর তাঁদের গাঁয়ের নাম বলিয়া দিয়াছ, মনে আছে? তাই শুনিয়াই বাবু চিনিতে পারিলেন। তোমার উ-বাবুর একটা বড় মোকদ্দমা তাঁর হাতে ছিল—তার ছল করিয়া তোমার উ-বাবুকে কলিকাতায় আসিতে লিখিলেন। তার পর নিমন্ত্রণ।

আমি। তারপর হাত পাতিয়া বুড়ীর ডালটুকু নেওয়া।

সুভা। হাঁ, সেটাও আমাদের ষড়যন্ত্র।

আমি। তা, আমার পরিচয় কিছু দেওয়া হয়েছে কি?

সুভা। আ সর্ব্বনাশ! তা কি দেওয়া যায়? তোমাকে ডাকাতে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর কোথায় গিয়েছিলে, কি বৃত্তান্ত, তা কে জানে? তোমার পরিচয় পেলে কি ঘরে নেবে? বল্‌বে, একটা গতিয়ে দিচ্ছে। র-বাবু বলেন, এখন তুমি নিজে যা করতে পার।

আমি। আমি একবার কপাল ঠুকিয়া দেখিব—না হয় ডুবিয়া মরিব। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা না হইলে কি করিব?

সুভা। কখন্ দেখা কর্‌বে, কোথায় দেখা কর্‌বে?

আমি। তোমরা যদি এত করিয়াছ, তবে এ-বিষয়েও একটু সাহায্য কর। তাঁর বাসায় গেলে দেখা হইবে না,—কেই-বা আমায় নিয়ে যাবে, কেই-বা দেখা করাইবে? এইখানেই দেখা করিতে হইবে।

সুভা। কখন্?

আমি। রাত্রে সবাই শুইলে।

সুভা। তাহা হইলে তাঁকে রাত্রে আটকাইতে হয়। নিকটে তাঁর বাসা। তা ঘটিবে কি? দেখি একবার বাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে।

সুভাষিণী রমণবাবুকে ডাকাইল। তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হইল, তাহা আমাকে আসিয়া বলিল। র-বাবু যাহা পারেন, তাহা এই ঃ—"তিনি এখন মোকদ্দমার কাগজ-পত্র দেখিবেন না—একটা ওজর করিয়া রাখিবেন। কাগজ দেখিবার জন্য সন্ধ্যার পর সময় অবধারণ করিবেন। সন্ধ্যার পর তোমার স্বামী আসিলে কাগজ-পত্র দেখিবেন। কাগজ-পত্র দেখিতে-দেখিতে একটু রাত্রি করিবেন। রাত্রি হইলে আহারের জন্য অনুরোধ করিবেন। কিন্তু তারপর তোমার বিদ্যায় যা থাকে, তা করিও। রাত্রে থাকিতে আমরা কি বলিয়া অনুরোধ করিব?"

আমি বলিলাম, "সে অনুরোধ তোমাদের করিতে হইবে না,

আমিই করিব। এখন আমার অনুরোধ তাঁহার কাছে পাঠাই কি প্রকারে? একছত্র লিখিয়া দিব। সেই কাগজটুকু কেহ তাঁহার কাছে দিয়ে এলেই হয়।"

সুভা। হারাণী বিশ্বাসী, তার হাতে পাঠাও না?

আমি। তুমি যদি বারণ না কর, তবে সে যাইতে পারে।

সুভাষিণী অনেকক্ষণ ভাবিল। বলিল, "সন্ধ্যার পর তাকে এই কথার জন্য আসিতে বলিও।"

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আমাকে এগ্‌জামিন দিতে হইল

সন্ধ্যার পর আমার স্বামী কাগজ-পত্র লইয়া রমণবাবুর কাছে আসিলেন। আমি হারাণীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, সে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি গো, এত হাসি কেন?"

হারাণী হাসিতে হাসিতে বলিল, "এখন কি করতে হবে বল—ক'রে আসি।"

আমি তখন এক টুকরা কাগজে একখানি পত্র লিখিলাম। পত্রে তাঁহাকে রাত্রিতে এই বাড়ীতে থাকিতে অনুরোধ জানাইলাম।

হারাণী তাহার উত্তর লইয়া ফিরিয়া আসিল। একটা ছোট্ট উত্তর "আচ্ছা!"

আমি তখন হারাণীকে বলিলাম, "যদি এত করলি, তবে আর-একটা করিতে হইবে। দুপুর রাত্রে আমাকে তার শোবার ঘরটা দেখাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।"

হারাণী। আচ্ছা, কোন দোষ নাই ত?

আমি। কিছু না। উনি আর-জন্মে আমার স্বামী ছিলেন?

হারাণী। আর জন্মে কি এ-জন্মে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "চুপ!"

হারাণী হাসিয়া বলিল, "যদি এ-জন্মের হন, তবে আমি পাঁচ শত টাকা বখ্‌শিশ নিব।"

আমি তখন সুভাষিণীর কছে গিয়া এ সকল সংবাদ দিলাম। সুভাষিণী আমাকে লইয়া গিয়া ঘরে কবাট দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি, কয়েদ কেন?"

সুভাষিণী বলিল, “তোমায় সাজাইব।” আমার চক্ষে জল আসিল, আমি না বলিতে পারিলাম না। সুভাষিণী তাহার নিজের গহনা দিয়া আমাকে সাজাইয়া দিল। সাজ সজ্জা শেষ হইলে, হাসিতে হাসিতে সুভাষিণী বলিল, “কেমন করে স্বামীর সঙ্গে প্রথম কথা বলবি, তার এগ্‌জামিন দে দেখি ? এই আমি যেন উ-বাবু।” এই বলিয়া সে সোফার উপর জমকাইয়া বসিল। তখন যে বিদ্যার পরিচয় পাঠক পশ্চাৎ পাইবেন, সুভাষিণীকেও তাহার কিছু পরিচয় দিলাম।

———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ
আমার প্রাণত্যাগের প্রতিজ্ঞা

গভীর রাত্রিতে বাড়ীর সকলে ঘুমাইলে হারাণী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘর দেখাইয়া দিয়া আসিল। আমি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বালিকা বয়স উত্তীর্ণ হইবার পর এই আমার প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ। সে যে কি সুখ, তাহা কেমন করিয়া বলিব? আমি অত্যন্ত মুখরা, কিন্তু—যখন প্রথম তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে গেলাম, কিছুতেই কথা ফুটিল না। কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। নিজের ভাগ্যের কথা ভাবিয়া আমার দুই চোখ ফাটিয়া জল ঝরিতেছিল, কিছুতেই তাহা রোধ করিতে পারিলাম না।

তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং দেখিলাম সমবেদনায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল। কিন্তু নিজের পরিচয় দেবার আগে, তাঁহার বৃত্তান্ত সমস্ত আগে জানা দরকার। তিনি পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন কিনা, পুত্র-কন্যা আছে কিনা, আমার সম্বন্ধে তাঁহার কি ধারণা, এই সব আগে না জানিয়া নিজের পরিচয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। তাই বহুকষ্টে নিজেকে চাপিয়া রাখিয়া কৌশলে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। শুনিলাম, তিনি আর বিবাহ করেন নাই।

সপত্নী হয় নাই, শুনিয়া খুব আহ্লাদ হইল। বলিলাম, "আপনারা বড়লোক, এটি তেমনই বিবেচনার কাজ হইয়াছে। নইলে যদি এর পর আপনার স্ত্রীকে পাওয়া যায়, তবে দুই সতীনে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি বাধিবে।"

কিন্তু তাঁহার প্রথম স্ত্রীর অ র্দ্ধান সম্বন্ধে তাঁহার কি ধারণা তাহা তো জানিতে হইবে। সেইজন্য কৌশলে এক প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন,

"সেই স্ত্রীকে পাইলেও আমি গ্রহণ করিব, এমন বোধ হয় না। তাহার আর জাতি নাই বিবেচনা করিতে হইবে।"

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এত আশাভরসা সব নষ্ট হইল। তবে আমার পরিচয় পাইলে, আমাকে আপন স্ত্রী বলিয়া চিনিলেও, আমাকে গ্রহণ করিবেন না। আমার এবারকার মত নারীজন্ম বৃথা হইল।

সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "যদি এখন তাঁহার দেখা পান, কি করিবেন?"

তিনি অম্লান বদনে বলিলেন, "তাঁকে ত্যাগ করিব।"

কি নির্দ্দয়! আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। পৃথিবী আমার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল।

সেই রাত্রিতে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, "ইনি আমাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, নচেৎ আমি প্রাণত্যাগ করিব।"

———

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কুলের বাহিরে

এই ভাবে আশাহত হইয়া মনে মনে যখন নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, তখন তিনি আমাকে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অপরিচিতা আমাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। তাঁহার গৃহে স্থান দিবার জন্যও রাজী হইলেন। আমি তো জানি, তিনিই আমার স্বামী। অতএব তাঁহার সঙ্গে যাইতে আমার দোষ কি? সুতরাং আমি যাইতে প্রস্তুত হইলাম। তিনি গাড়ী লইয়া আসিলেন। বাড়ীতে তখন সবাই নিদ্রিত। আমি নিঃশব্দে তাঁহার সহিত গাড়ীতে গিয়া বসিলাম।

তাঁহার বাসা সিমলায়, অল্প দূরে। তাঁর বাসায় গিয়া দেখিলাম, দুই মহল বাড়ী। একটি ঘরে আমি আগে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলাম। স্বামী বাহিরে পড়িয়া রহিলেন। আমি দ্বার খুলিলাম না। অগত্যা তিনি অন্যত্র বিশ্রাম করিলেন।

অনেক বেলা হইলে দ্বার খুলিলাম, দেখিলাম, স্বামী দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমি তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বলিলাম, "হয় আমাকে রামরাম দত্তের বাড়ী পাঠাইয়া দাও, নচেৎ অষ্টাহ আমার সঙ্গে আলাপ করিও না। এই অষ্টাহ তোমার পরীক্ষা।"

তিনি অষ্টাহ পরীক্ষা স্বীকার করিলেন।

ষোড়শ-সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ফাঁসির পর মকদ্দমার তদ্বারক

পরীক্ষা ফাঁসিয়া গেল। অষ্টাহ অতীত হইলে, বিনা বাক্যব্যয়ে উভয়ে উভয়ের অধীন হইলাম এবং কলিকাতায় দিনকতক সুখে-স্বচ্ছন্দে রহিলাম। তারপর দেখিলাম, স্বামী একদিন একখানা চিঠি হাতে করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত বিমর্ষ কেন?" তিনি বলিলেন, "বাড়ী হইতে চিঠি আসিয়াছে, বাড়ী যাইতে হইবে।"

আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "আমি।" আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম—মাটিতে বসিয়া পড়িলাম।

তিনি সস্নেহে হাত ধরিয়া আমায় তুলিয়া আদর করিয়া অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন। বলিলেন, "সেই কথাই আমিও ভাবিতেছিলাম। তোমায় ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।"

আমি। সেখানে আমাকে কি বলিয়া পরিচয় করিবে? কি প্রকারে, কোথায় রাখিবে?

তিনি। তাই ভাবিতেছি সহর নয় যে, আর-একটা জায়গায় রাখিব, কেহ জানিতে পারিবে না। বাপ-মা'র চক্ষের উপর তোমায় কোথায় রাখিব?

আমি। না গেলেই নয়।

তিনি। না গেলেই নয়।

আমি। কতদিনে ফিরবে? শীঘ্র ফের যদি, আমাকে না হয় এইখানেই রাখিয়া যাও।

তিনি। শীঘ্র ফিরিতে পারিব, এমন ভরসা নাই। কলিকাতায় আমরা কালে-ভদ্রে আসি।

আমি। তুমি যাও—আমি তোমার জঞ্জাল হইব না! আমার কপালে যা থাকে, তাই ঘটিবে।

তিনি আমাকে আর কথা কহিতে দিলেন না। বলিলেন, "আজ আর এ-কথায় কাজ নাই। আজ ভাবি। যা ভাবিয়া স্থির করিব, কাল বলিব।"

বৈকালে তিনি রমণবাবুকে আসিতে লিখিলেন, "গোপনীয় কথা আছে। এখানে না আসিলে বলা হইবে না।"

রমণবাবু আসিলেন। আমি কপাটের আড়াল হইতে শুনিতে লাগিলাম, কি কথা হয়। স্বামী বলিলেন—"আপনাদিগের সেই পাচিকাটি—তাহার নাম কি?"

রমণ। কুমুদিনী।

উপেন্দ্র। তাহার বাড়ী কোথায়?

রমণ। এখন বলিতে পারি না!

উ। সধবা, না, বিধবা?

র। সধবা।

উ। তাহার স্বামী কে, জানেন?

র। জানি।

উ। কে?

র। এক্ষণে বলিবার আমার অধিকার নাই।

উ। কোন কিছু গুপ্ত রহস্য আছে না কি?

র। আছে।

উ। আপনারা উহাকে কোথায় পাইলেন?

র। আমার স্ত্রী তাঁহার মাসীর কাছে উহাকে পাইয়াছেন।

উ। যাক্—এ সব বাজে কথা। উহার চরিত্র কেমন?

র। এমন উৎকৃষ্ট চরিত্র দেখা যায় না।

উ। উহার বাড়ী কোথায়, কেন বলিতেছেন না?

র। বলিবার অধিকার নাই।

উ। স্বামীর বাড়ী কোথায়?

র। ঐ উত্তর।

উ। স্বামী জীবিত আছে?

র। আছে।

উ। আপনি তাহাকে চিনেন!

র। চিনি।

উ। স্ত্রীলোকটি এখন কোথায়?

র। আপনার এই বাড়ীতে।

স্বামী মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন?"

র। আমার বলিবার অধিকার নাই। আপনার জেরা কি ফুরাইল?

উ। ফুরাইল। কিন্তু আপনি ত জিজ্ঞাসা করিলেন না যে, আমি কেন আপনাকে এ-কথা জিজ্ঞাসা করিলাম?

র। দুই কারণে জিজ্ঞাসা করিলাম না; একটি এই যে, জিজ্ঞাসা করিলে আপনি বলিবেন না—সত্য কি না?

উ। সত্য। দ্বিতীয় কারণটি কি?

র। আমি জানি, যে-জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

উ। তাও জানেন? কি বলুন দেখি?

র। তা বলিব না।

উ। আচ্ছা, আপনি ত সব জানেন দেখিতেছি। বলুন দেখি, আমি যে অভিসন্ধি করিতেছি, তাহা ঘটিতে পারে না কি?

র। খুব ঘটিতে পারে। আপনি কুমুদিনীকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

উ। আর-একটা কথা। আপনি কুমুদিনীর সম্বন্ধে যাহা জানেন, তাহা সব একটা কাগজে লিখিয়া দস্তখত করিয়া দিতে পারেন?

র। পারি—এক সর্ত্তে। আমি লিখিয়া পুলিন্দায় সীল করিয়া কুমুদিনীর কাছে দিয়া যাইব। আপনি এক্ষণে তাহা পড়িতে পারিবেন না। দেশে গিয়া পড়িবেন। রাজি?

স্বামী মহাশয় অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "রাজি। আমার অভিপ্রায়ের পোষক হইবে ত?"

র। হইবে।

রমণবাবু উঠিয়া গেলে, উ-বাবু আমার নিকটে আসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ-সব কথা হইতেছিল কেন?"

তিনি বলিলেন, "সব শুনিয়াছ না কি?" আমি বলিলাম, "হাঁ, শুনিয়াছি। ভাবিতেছিলাম, আমি ত তোমায় খুন করিয়া ফাঁসি গিয়াছি, ফাঁসির পর আর তদারক কেন?"

তিনি। এখনকার আইনে তা হইতে পারে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ভারি জুয়াচুরির বন্দোবস্ত

সেদিন দিবা রাত্রি, আমার স্বামী অন্যমনে ভাবিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গে বড় কথাবার্ত্তা কহিলেন না—আমাকে দেখিলেই আমার মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহার অপেক্ষা আমার চিন্তার বিষয় বেশী, কিন্তু তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া আমার প্রাণের ভিতর বড় যন্ত্রণা হইতে লাগিল। আমি আপনার দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া, তাঁহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিছুতেই কিছু হইল না। আমার কান্নার উপর আরও কান্না বাড়িল।

পরদিন প্রাতে স্নানাহ্নিকের পর জলযোগ করিয়া তিনি আমাকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "বোধ করি, যা জিজ্ঞাসা করিব, সকল কথার প্রকৃত উত্তর দিবে?"

তখন রমণবাবুকে জেরা করার কথাটা মনে পড়িল। বলিলাম, "যাহা বলিব সত্যই বলিব। কিন্তু সকল কথার উত্তর না দিতে পারি।"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী জীবিত আছেন শুনিলাম। তাঁহার নাম-ধাম প্রকাশ করিবে?"

আমি। এখন না, দিনকতক যাক।

তিনি। এখন কোথায় আছেন, বলিবে?

আমি। এই কলিকাতায়।

তিনি। (একটু চমকিত হইয়া) তুমি কলিকাতায়, তোমার স্বামী কলিকাতায়, তবে তুমি তাঁর কাছে থাক না কেন?

আমি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় নাই।

তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামী-স্ত্রীতে পরিচয় নাই? এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা।"

আমি। সকলের কি থাকে? তোমার কি আছে?

একটু অপ্রতিভ হইয়া তিনি বলিলেন, “সে ত কতকগুলো দুর্দ্দৈবে ঘটিয়াছে।”

আমি। দুর্দ্দৈব সর্ব্বত্র আছে।

তিনি। যাক—তিনি ভবিষ্যতে তোমার উপর কোন দাবিদাওয়া করিবার সম্ভাবনা আছে কি?

আমি। সে আমার হাত। আমি যদি তাঁর কাছে আত্ম-পরিচয় দিই, তবে কি হয় বলা যায় না।

তিনি। তবে তোমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলি। তুমি খুব বুদ্ধিমতী, তাহা বুঝিয়াছি। তুমি কি পরামর্শ দাও শুনি।

আমি। বল দেখি।

তিনি। আমাকে বাড়ী যাইতে হইবে।

আমি। বুঝিলাম।

তিনি। বাড়ী গেলে শীঘ্র ফিরিতে পারিব না।

আমি। তাও শুনিতেছি।

তিনি। তোমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিব না। আমি তোমাকে লইয়া যাইব।

আমি। কোথায় রাখিবে? কি পরিচয়ে রাখিবে?

তিনি। একটা ভারি জুয়াচুরি করিব। তাই কাল সমস্ত দিন ভাবিয়াছি। তোমার সঙ্গে কথা কহি নাই।

আমি। বলিবে যে, এই ইন্দিরা—রামরাম দত্তের বাড়ীতে খুঁজিয়া পাইয়াছি?

তিনি। আ সর্ব্বনাশ! তুমি কে?

স্বামী মহাশয়, নিস্পন্দ হইয়া, দুই চক্ষের তারা উপর দিকে তুলিয়া, আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন, কি হইয়াছে?”

তিনি। ইন্দিরা নাম জানিলে কি প্রকারে? আর আমার মনের গুপ্ত অভিপ্রায়-বা জানিলে কি প্রকারে? তুমি মানুষ, না মায়াবিনী?

আমি। সে পরিচয় পশ্চাৎ দিব। এখন আমি তোমাকে পাল্টা জেরা করিব, স্বরূপ উত্তর দাও।

তিনি। (সভয়ে) বল।

আমি। সেদিন তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে, তোমার স্ত্রীকে পাওয়া গেলেও তুমি গ্রহণ করিবে না, তাহাকে ডাকাতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে; তোমার জাতি যাইবে। আমাকে ইন্দিরা বলিয়া ঘরে লইয়া গেলে সে ভয় নাই কেন?

তিনি। সে ভয় নাই? খুবই আছে। কিন্তু জাতি বড়, না, প্রাণ বড়? আর সেটাও তেমন বিষম সঙ্কট নয়। ইন্দিরা যে জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিল, এমন কথা কেহ বলে না। কালাদীঘিতে যাহারা ডাকাতি করিয়াছিল, তাহারা ধরা পড়িয়াছে। তাহারা একরার করিয়াছে। একবারে বলিয়াছে, ইন্দিরার গহনা-গাঁটি মাত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। কেবল এখন সে কোথায় আছে, কি হইয়াছে, তাই কেহ জানে না; পাওয়া গেলে একটা কলঙ্কশূন্য বৃত্তান্ত অনায়াসেই তৈয়ার করিয়া বলা যাইতে পারে। ভরসা করি, রমণবাবু যাহা লিখিয়া দিবেন, তাহাতে তাহার পোষকতা করিবে। তাতে যদি কোন কথা উঠে, গ্রামে কিছু সামাজিক দিলেই গোল মিটিবে। আমাদের টাকা আছে—টাকায় সবাইকে বশীভূত করা যায়।

আমি। যদি সে আপত্তি কাটে, তবে আর আপত্তি কি?

তিনি। গোল তোমাকে লইয়া; তুমি জাল ইন্দিরা যদি ধরা পড়?

আমি। তোমাদের বাটিতে আমাকেও কেহ চেনে না, আসল ইন্দিরাকেও কেহ চেনে না। কেন না, কেবল একবার বালিকাবয়সে তাহাকে তোমরা দেখিয়াছিলে, তবে ধরা পড়িব কেন?

তিনি। কথায়। নূতন লোক গিয়া জানালোক সাজিলে, সহজে কথায় ধরা পড়ে।

আমি। তুমি না হয়, আমাকে সব শিখাইয়া-পড়াইয়া রাখিবে।

তিনি। তা ত মনে করিয়াছি, কিন্তু সব কথা ত শিখানো যায়

না। মনে কর, যদি যে-কথা শিখাইতে মনে হয় নাই, এমন কথা পড়ে, তবে ধরা পড়িবে। মনে কর, কখন আসল ইন্দিরা আসিয়া উপস্থিত হয়, উভয়ের মধ্যে বিচারকালে, পূর্ব্বকথা জিজ্ঞাসাবাদ হইলে তুমিই ধরা পড়িবে।

আমি একটু হাসিলাম। এমন অবস্থায় হাসিটা আপনি আসে। কিন্তু এখন আমার প্রকৃত পরিচয় দিবার সময় হয় নাই। আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমায় কেহ ঠকাইতে পারে না। তুমি এইমাত্র আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছিলে যে, আমি মানুষী কি মায়াবিনী। আমি মানুষী নহি। আমি কি, তাহা পরে বলিব। এখন ইহাই বলিব যে, আমাকে কেহ ঠকাইতে পারিবে না।"

স্বামী মহাশয় স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বুদ্ধিমান্ কর্ম্মঠ লোক। নহিলে এত অল্পদিনে এত টাকা রোজগার করিতে পারিতেন না। মানুষটা বাহিরে একটু নীরস—কাঠ-কাঠ রকম,—কিন্তু ভিতরে বড় মধুর, বড় কোমল, বড় স্নেহশীল ; কিন্তু রমণবাবুর মত, এখনকার ছেলেদের মত উচ্চশিক্ষিত নহেন। তিনি ঠাকুর-দেবতা খুব মানিতেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া ভূত, প্রেত, ডাকিনী, মায়াবিনী প্রভৃতির গল্প শুনিয়াছিলেন। সে-সকল একটু বিশ্বাস করিতেন। তিনি আমার দ্বারা যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার এই সময়ে স্মরণ হইল ; যাহাকে আমার অসাধারণ বুদ্ধি বলিতেন, তাহাও স্মরণ হইল। যাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাহাও স্মরণ হইল। অতএব আমি যে বলিলাম, আমি মানুষী নহি, তাহাতে তাঁহার একটু বিশ্বাস হইল। তিনি কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিন্তু তারপর নিজ বুদ্ধিবলে, সে বিশ্বাসটুকু দূর করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কেমন মায়াবিনী, আমি যা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি ?"

আমি। জিজ্ঞাসা কর।

তিনি। আমার স্ত্রীর নাম ইন্দিরা, জান, তার বাপের নাম কি ?

আমি। হরমোহন দত্ত।

তিনি। তাঁহার বাড়ী কোথায় ?

আমি। মহেশপুর।

তিনি। তুমি কে!!!

আমি। তা ত বলিয়াছি যে, পরে বলিব। মানুষ নই।

তিনি। তুমি বলিয়াছিলে, তোমার বাপের বাড়ী কালাদীঘি। কালাদীঘির লোক এ-সকল জানিলে জানিতে পারে। এইবার বল, হরমোহন দত্তের বাড়ীর সদর দরওয়াজা কোন্ মুখ ?

আমি। দক্ষিণমুখ। একটা বড় ফটকের দুই পাশে দুইটা সিংহী।

তিনি। তাঁর কয় ছেলে ?

আমি। এক।

তিনি। নাম কি ?

আমি। বসন্তকুমার।

তিনি। তার কয় ভগিনী ?

আমি। তোমার বিবাহের সময় দুইটি ছিল।

তিনি। নাম কি ?

আমি। ইন্দিরা আর কামিনী।

তিনি। তাঁর বাড়ীর নিকট কোন পুকুর আছে ?

আমি। আছে। নাম দেবীদীঘি, তাতে খুব পদ্ম ফোটে।

তিনি। হাঁ, তা দেখিয়াছিলাম। তুমি কখন মহেশপুরে ছিলে ? তার বিচিত্র কি ? তাই এত জান। আর গোটাকতক কথা বল দেখি। ইন্দিরার বিবাহে সম্প্রদান কোথায় হয় ?

আমি। পূজার দালানের উত্তর-পশ্চিম কোণে।

তিনি। কে সম্প্রদান করে ?

আমি। ইন্দিরার খুড়া কৃষ্ণমোহন দত্ত।

তিনি। স্ত্রী-আচারকালে একজন আমার বড় জোরে কান মলিয়া দিয়াছিল। তাহার নাম আমার মনে আছে। বল দেখি তার নাম ?

আমি। বিন্দুঠাকুরাণী—বড়-বড় চোখ, রাঙ্গা-রাঙ্গা ঠোঁট, নাকে ফাঁদি নথ।

তিনি। ঠিক! বোধহয়, তুমি বিবাহের দিন উপস্থিত ছিলে। তাদের কুটুম্ব নও ত?

আমি। কুটুম্বের মেয়ে, চাকরাণী কি রাঁধুনীর মেয়ের জানা সম্ভব নয়, এমন দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা কর না।

তিনি। ইন্দিরার বিবাহ কবে হইয়াছিল?

আমি। —সালে বৈশাখ মাসের ২৭ তারিখে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে।

তিনি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবে।"

তিনি বলিলেন, "না। হয় তুমি স্বয়ং ইন্দিরা, নয় কোন মায়াবিনী।"

———

উনবিংশ পরিচ্ছেদ
বিদ্যাধরী

দেখিলাম, এক্ষণে অনায়াসে আত্মপরিচয় দিতে পারি। আমার স্বামীর নিজ মুখ হইতে আমার পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে আমি পরিচয় দিব না স্থির করিয়াছিলাম ; তাই বলিলাম, "এখন আত্মপরিচয় দিব। কামরূপে আমার অধিষ্ঠান। আমি আদ্যাশক্তির মহামন্দিরে তাঁহার পার্শ্বে থাকি। লোকে আমাদিগকে ডাকিনী বলে, কিন্তু আমরা ডাকিনী নই। আমরা বিদ্যাধরী। আমি মহামায়ার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছিলাম, সেইজন্য অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়া এই মানবরূপ ধারণ করিয়াছি। পাচিকাবৃত্তিও ভগবতীর শাপের ভিতর। তাই অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। এক্ষণে আমার শাপ হইতে মুক্ত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি জগন্মাতাকে স্তবে প্রসন্ন করিলে, তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন যে, মহাভৈরবী দর্শন করিবামাত্র আমি মুক্তিলাভ করিব ?"

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায়।"

আমি বলিলাম, "মহাভৈরবীর মন্দির—মহেশপুরে, তোমার শ্বশুরবাড়ীর উত্তরে। সে তাঁহাদেরই ঠাকুরবাড়ী। বাড়ীর গায়ে খিড়কি দিয়া যাতায়াতের পথ আছে। চল, মহেশপুরে যাই।"

তিনি ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি বুঝি আমার ইন্দিরাই হইবে। কুমুদিনী যদি ইন্দিরা, তাহা হইলে কি সুখ ! পৃথিবীতে তাহা হইলে আমার মত সুখী কে ?"

আমি। যেই হই, মহেশপুর গেলে সব গোল মিটিবে।

তিনি। তবে চল, কাল এখান হইতে যাত্রা করি। আমি তোমাকে কালাদীঘি পার করিয়া দিয়া মহেশপুরে পাঠাইয়া দিয়া, নিজে আপাততঃ বাড়ী যাই। দুই-একদিন সেখানে থাকিয়া আমি মহেশপুর যাইব। যোড়হাতে তোমার কাছে এই ভিক্ষা করি যে,

তুমি ইন্দিরাই হও, আর কুমুদিনীই হও, আর বিদ্যাধরীই হও, আমাকে ত্যাগ করিও না।

এই বলিয়া তিনি সদরে গেলেন। সেখানে লোক আসিয়াছিল। লোক আর কেহ নহে, রমণবাবু। রমণবাবু আমার স্বামীর সঙ্গে অন্তঃপুরে আসিয়া আমাকে সীল-করা পুলিন্দা দিয়া গেলেন। আমার স্বামীকে সে-সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমাকেও সেই উপদেশ দিলেন। শেষে বলিলেন, "সুভাষিণীকে কি বলিব ?"

আমি বলিলাম, "বলিবেন, কাল আমি মহেশপুর যাইব। গেলেই আমি শাপ হইতে মুক্ত হইব।"

স্বামী বলিলেন, "আপনাদের এ-সব জানা আছে না কি ?"

চতুর রমণবাবু বলিলেন, "আমি সব জানি না, কিন্তু আমার স্ত্রী সুভাষিণী সব জানেন।"

বাহিরে আসিয়া স্বামী মহাশয় রমণবাবুকে বলিলেন, "আপনি ডাকিনী, যোগিনী, বিদ্যাধরী প্রভৃতি বিশ্বাস করেন ?"

রমণবাবু রহস্যখানা কতক বুঝিয়াছিলেন, বলিলেন, "করি। সুভাষিণী বলেন, কুমুদিনী শাপগ্রস্ত বিদ্যাধরী।"

স্বামী বলিলেন, "কুমুদিনী কি ইন্দিরা, আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিবেন।"

রমণবাবু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যাধরীর অন্তর্দ্ধান

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইলে পর আমরা যথাকালে উভয়ে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। তিনি আমাকে কালাদীঘি নামক সেই হত-ভাগ্য দীঘি পার করিয়া দিয়া নিজালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সঙ্গের লোকজন আমাকে মহেশপুর লইয়া গেল, গ্রামের বাহিরে

সেইখানে আলো ধরিয়া কামিনী আমার স্বামীকে আমার কাছে লইয়া আসিল। তিনি আমার পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িলেন। ডাকিলেন, "কুমুদিনী! কুমুদিনী! যদি আসিয়াছ—ত আর আমায় ত্যাগ করিও না।"

তিনি বার-দুই-চার এই কথা বলার পর, কামিনী চটিয়া উঠিয়া বলিল, "আয় দিদি! উঠে আয়! ও মিন্‌ষে কুমুদিনী চেনে, তোকে চেনে না।"

তিনি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "দিদি! দিদি কে?"

কামিনী রাগ করিয়া বলিল, "আমার দিদি—ইন্দিরে। কখনও নাম শোন নি?"

তখন স্বামী মহাশয় সব বুঝিয়া, আহ্লাদে অজ্ঞান হইয়া, আমাকে মনে করিয়া কামিনীর হাত ধরিতেই সে তাঁর গালে এক চড় মারিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

সেদিনের আহ্লাদের কথা বলিয়া উঠিতে পারি না। বাড়ীতে খুব উৎসব বাধিল। সেইরাত্রে কামিনীতে আর উ-বাবুতে প্রায় একশতবার বাগযুদ্ধ হইল, সকলবারেই উ-বাবু হারিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সেকালে যেমন ছিল

কালাদীঘির ডাকাইতির পর আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, স্বামী মহাশয় এক্ষণে আমার কাছে সব শুনিলেন। রমণবাবু ও সুভাষিণী যেরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিল, তাহাও শুনিলেন। একটু রাগও করিলেন। বলিলেন, "আমাকে এত ঘুরাইবার ফিরাইবার প্রয়োজনটা কি ছিল?" প্রয়োজনটা কি ছিল, তাহাও বুঝাইলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু কামিনী সন্তুষ্ট হইল না। কামিনী বলিল, "তোমায় ঘানিগাছে ঘুরায় নাই, অমনি ছাড়িয়াছে,

এইটুকু দিদির দোষ। আবার আব্দার নিলেন কি না, গ্রহণ করবেন না! আরে মিন্‌ষে যখন আমাদের আলতা-পরা শ্রীপাদপদ্মখানি ভিন্ন তোমাদের জেতের গতিমুক্তি নাই, তখন অত বড়াই কেন ?”

আমি আর হাসি রাখিতে পারিলাম না। উ-বাবু অপ্রতিভ হইয়া কামিনীকে বলিলেন,“যা ভাই, আর জ্বালাস নে। খুব বক্তৃতা দিলি, তার জন্যে এই পানের খিলিটা বখ্‌শিশ নিয়ে যা।”

তারপর আমার পিতামাতার অনুরোধে উ-বাবু আর একদিন থাকিতে সম্মত হইলেন। সে দিনও বড় আনন্দে গেল। দলে-দলে পাড়ার মেয়েরা আসিয়া সন্ধ্যার পর আমার স্বামীকে ঘেরিয়া লইয়া মজলিস্ করিয়া বসিল। সেই প্রকাণ্ড পুরীর একটা কোণের ঘরে মেয়েদের মজলিস্।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

আমি পরদিন স্বামীর সঙ্গে শিবিকারোহণে শ্বশুরবাড়ী গেলাম। স্বামীর সঙ্গে যাইতেছি, সে একটা সুখ বটে, কিন্তু সেবার যে যাইতেছিলাম, সে আর এক প্রকারের সুখ। যাহা কখন পাই নাই, তাই পাইবার আশায় যাইতেছিলাম; এখন যাহা পাইলাম, তাই আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিলাম। একটা কবির কাব্য, অপরটা ধনীর ধন। ধনীর ধন কবির কাব্যের সমান কি? যাহারা ধনোপার্জ্জন করিয়া বুড়া হইয়াছে, কাব্য হারাইয়াছে, তাহারাও এ-কথা বলে না। তাহারা বলে, ফুল যতক্ষণ গাছে ফোটে, ততক্ষণই সুন্দর; তুলিলে আর তেমন সুন্দর থাকে না। স্বপ্ন যেমন সুখের, স্বপ্নের সফলতা কি তত সুখের হয়? আকাশ যেমন বস্তুতঃ নীল নয়, আমরা নীল দেখি মাত্র, ধন তেমনই। ধন সুখের নয়, আমরা সুখের বলিয়া মনে করি।

হক ও রক্ষকদিগকে অবস্থিতি করিতে বলিয়া আমি পদব্রজে গ্রামের ধ্য প্রবেশ করিলাম। পিতার গৃহ সম্মুখে দেখিয়া, এক নির্জ্জন নে বসিয়া অনেক রোদন করিলাম। তাহার পর গৃহমধ্যে প্রবেশ রিলাম। সম্মুখে পিতাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি মাকে চিনিতে পারিয়া আহ্লাদে বিবশ হইলেন। সে-সকল কথা হানে বলিবার অবসর নাই।

আমি এতদিন কোথায় ছিলাম, কি প্রকারে আসিলাম, —তাহা ছুই বলিলাম না। পিতামাতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "এর রে বলিব।"

সময়ান্তরে স্থূলকথা তাঁহাদিগকে বলিলাম; কিন্তু সব কথা নহে। তটুকু বুঝিতে দিলাম যে, পরিশেষে আমি স্বামীর নিকটেই ছিলাম, মীর নিকট হইতেই আসিয়াছি এবং তিনিও দুই-এক দিনের মধ্যে খানে আসিবেন। সব কথা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া কামিনীকে বলিলাম। মিনী আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট, বড় রঙ্গ ভালবাসে। সে লিল, "দিদি, যখন মিত্রজা এতবড় গোবর-গণেশ, তাকে নিয়ে কটু রঙ্গ করিলে হয় না?"

আমি বলিলাম, "আমারও সেই ইচ্ছা।"

তখন দুই বহিনে পরামর্শ আঁটিলাম। সকলকে শিখাইয়া ঠিক রিলাম। বাপ-মাকেও একটু শিখাইতে হইল। কামিনী তাঁহাদিগকে ঝাইল যে, প্রকাশ্যে গ্রহণ করাটা এখনও হয় নাই, সেটা এইখানেই ইবে। আমরাই তাহা করিয়া লইব। তবে আমি যে এখানে াসিয়াছি, একথাটা তাঁহার জামাতা আসিলে তাঁহার সাক্ষাতে প্রকাশ না করেন।

পরদিন জামাতা আসিলেন। পিতামাতা তাঁহাকে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করিলেন। আমি আসিয়াছি, একথা বাহিরে কাহারও মুখে তিনি শুনিলেন না। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। যখন অন্তঃপুরে জলযোগ করিতে আসিলেন, তখন বড় বিষণ্ণবদন!

জলযোগের সময় আমি সম্মুখে রহিলাম না। কামিনী বসিল, আর দুই চারি জন জ্ঞাতিভগিনী ভাইজ বসিল। তখন সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, কামিনী অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তিনি যেন কলে উত্তর দিতে লাগিলেন; আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া সব শুনিতে দেখিতে লাগিলাম। পরিশেষে তিনি কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দিদি কোথায়?"

কামিনী খুব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি জানি কোথায়? কালাদীঘিতে সেই যে সর্ব্বনাশটা হইয়া গেল, তার পর ত আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।"

তাঁর মুখখানা বড় লম্বা হইয়া গেল, কথা আর কহিতে পারেন না। বুঝি কুমুদিনীকে হারাইলাম, এ-কথা মনে করিয়া থাকিবেন, কেন না তাঁর চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল।

চক্ষের জল সামলাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমুদিনী বলিয়া কোন স্ত্রীলোক আসিয়াছিল কি?"

কামিনী বলিল, "কুমুদিনী কি কে, তাহা বলিতে পারি না, একটা স্ত্রীলোক পরশুদিন পাল্কী করিয়া আসিয়াছিল বটে। সে বরাবর মহাভৈরবীর মন্দিরে গিয়া উঠিয়া দেবীকে প্রণাম করিল। অমনি একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত হইল, হঠাৎ মেঘ অন্ধকার হইয়া ঝড়বৃষ্টি হইল। সেই স্ত্রীলোকটা সেইসময় ত্রিশূল হাতে করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে আকাশে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেল!"

তিনি জলযোগ ত্যাগ করিলেন। হাত ধুইয়া মাথায় হাত দিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "যে-স্থান হইতে কুমুদিনী অন্তর্দ্ধান করিয়াছে তাহা দেখিতে পাই না?"

কামিনী বলিল, "পাওবৈ কি। অন্ধকার হয়েছে—আলো নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া কামিনী আমাকে ইঙ্গিত করিয়া গেল—"আগেই তুই যা। তারপর আলো নিয়ে উপেন্দ্রবাবুকে লইয়া যাইব।"

আমি আগে মন্দিরে গিয়া বারান্দায় বসিয়া রহিলাম।

কাব্যই সুখ। কেন না, কাব্য আশা, ধন ভোগ মাত্র। তাও সকলের কপালে নয়। অনেক ধনী লোক কেবল ধনাগারের প্রহরী মাত্র।

তবু সুখে-সুখেই শ্বশুরবাড়ী চলিলাম, সেখানে এবার নির্ব্বিঘ্নে পৌছিলাম। স্বামী মহাশয় মাতাপিতা সমীপে সমস্ত কথা সবিশেষ নিবেদন করিলেন। রমণবাবুর পুলিন্দা খোলা হইল। তাঁহার কথার সঙ্গে আমার সকল কথা মিলিল। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী সন্তুষ্ট হইলেন। সমাজের লোকও সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, কোন কথা তুলিল না।

আমি সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া, সুভাষিণীকে পত্র লিখিলাম। সুভাষিণীর জন্য সর্ব্বদা আমার প্রাণ কাঁদিত। আমার স্বামী আমার অনুরোধে রমণবাবুর নিকট হারাণীর জন্য পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। শীঘ্রই সুভাষিণীর উত্তর পাইলাম। উত্তর—আনন্দপরিপূর্ণ।

তারপর সুভাষিণীর সঙ্গে আর একবারমাত্র দেখা হইয়াছিল। তার কন্যার বিবাহের সময় বিশেষ অনুরোধে স্বামী আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। সুভাষিণীর কন্যাকে অলঙ্কার দিয়া সাজাইলাম—গৃহিণীকে উপযুক্ত উপহার দিলাম—যে যাহার যোগ্য তাহাকে সেইরূপ দান ও সম্ভাষণ করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, গৃহিণী আমার প্রতি ও আমার স্বামীর প্রতি অপ্রসন্ন। তাঁর ছেলের ভাল খাওয়া হয় না, কথাটা আমাকে অনেকবার শুনাইলেন। আমিও রমণবাবুকে কিছু রাঁধিয়া খাওয়াইলাম ; কিন্তু আর কখন গেলাম না। রাঁধিবার ভয়ে নয় ; গৃহিণীর মনোদুঃখের ভয়ে।

গৃহিণী ও রামরাম দত্ত অনেক দিন হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু আর যাওয়া ঘটে নাই। আমি সুভাষিণীকে ভুলি নাই। ইহজন্মে ভুলিব না। সুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না!

—সমাপ্ত—

বিশ্ব প্রতিভা সিরিজ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

১। বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ
২। ঋষি অরবিন্দ
৩। রাষ্ট্রনেতা জহরলাল
৪। যাদুকর মার্কনী
৫। সমুদ্রজয়ী কলম্বাস
৬। এব্রাহাম লিন্‌কলন্‌
৭। দ্বাদশ সূর্য্য

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

৮। সত্যাশ্রয়ী বাপুজী
৯। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ
১০। বলদর্পী হিটলার
১১। মহাপুরুষ আশুতোষ
১২। মহামনীষী জর্জ বার্ণার্ডশ

মহম্মদ ওয়াজেদ আলি প্রণীত

১৩। ছোটদের হজরত

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত

১৪। নেতাজী সুভাষ

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

১৫। দানবীর কার্ণেগী
১৬। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

১৭। ভগবানের চাবুক
১৮। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট

সরলা ও প্রফুল্ল নন্দী প্রণীত

১৯। প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট

রবিদাস সাহারায় প্রণীত

২০। আমাদের ভারতরত্ন ইন্দিরা
২১। আমাদের বাপুজী
২২। আমাদের নেতাজী
২৩। আমাদের রবীন্দ্রনাথ
২৪। আমাদের শ্রীমা সারদামণি
২৫। আমাদের রামমোহন রায়
২৬। আমাদের বিদ্যাসাগর
২৭। আমাদের চিত্তরঞ্জন
২৮। ভগিনী নিবেদিতা
২৯। যুগাবতার রামকৃষ্ণ
৩০। আমাদের লেনিন
৩১। আমাদের শরৎচন্দ্র
৩২। মাদার টেরেসা

দীনেশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩৩। বিপ্লবী স্ট্যালিন

শ্রীশান্তি দেবী প্রণীত

৩৪। বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা

সুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত

৩৫। আমাদের লোকমান্য তিলক
৩৬। লালা লাজপত রায়
৩৭। আমাদের লালবাহাদুর

মধুসূদন মজুমদার প্রণীত

৩৮। জনসেবক বিধানচন্দ্র

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত

৩৯। আমাদের সর্দার প্যাটেল

তাপস গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

৪০। আইনস্টাইন

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ কলিঃ-৯